Fajil by Anisul Haque

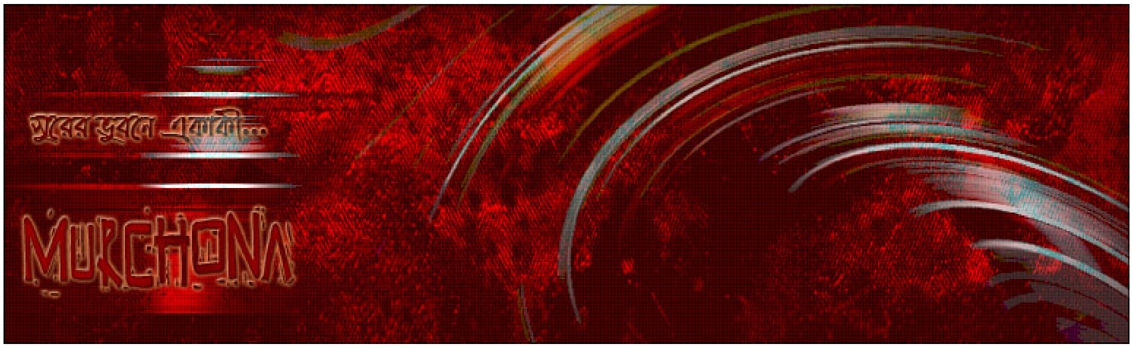

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

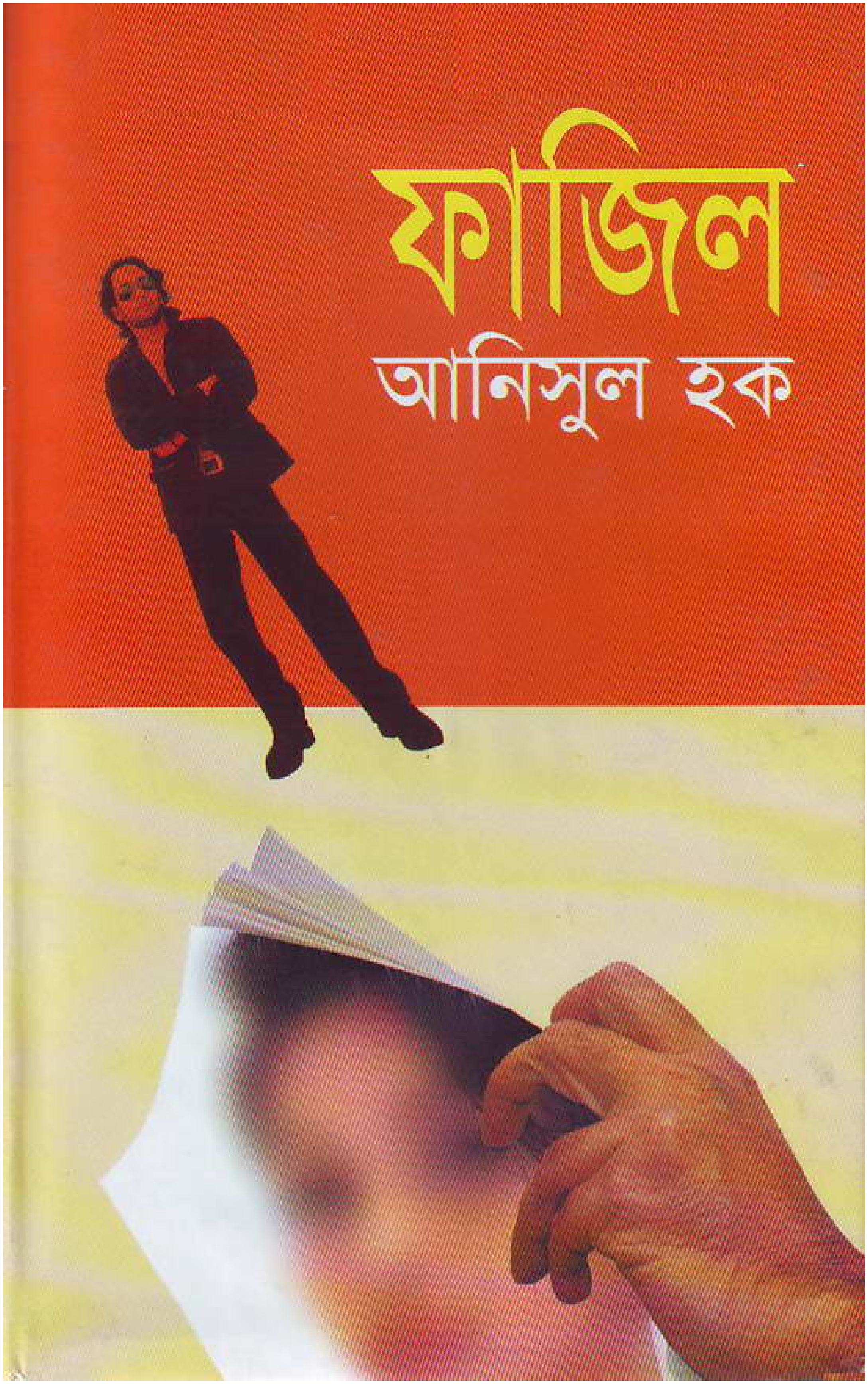
ফাজিল
আনিসুল হক

ফাজিল

মাসুদ রহমান কাজ করে সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ পত্রিকায়। সহকারী সম্পাদক পদে। সে খুবই দুর্বলচিত্তের মানুষ। সারাক্ষণ তার মনের মধ্যে কী যেন এক আশঙ্কা আর আতঙ্ক কাজ করে। নিরাপত্তাহীনতার এক অব্যাখ্যাত বোধ ঘিরে থাকে তাকে। তার মনের জোরটা কম। এ ছাড়া মাসুদের আর সবই ভালো। সে ভালো লেখে। সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ পত্রিকায় তার লেখা একটা কলাম নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কলামটি বেশ জনপ্রিয়। হালকা-পাতলা গড়ন, কোকড়ানো চুল, মাঝারি উচ্চতা, চোখে চশমা; উজ্জ্বল ফরসা গায়ের রং; অবিবাহিত ২৮ বছর বয়সী এই যুবক ঢাকার ইন্দিরা রোডে একটি বাড়ির চিলেকোঠার ঘরটি ভাড়া নিয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন করে।

তার অধীনে কাজ করে বাবু। শামসুজ্জামান বাবু। সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ পত্রিকায় বাবুর পদের নাম প্রতিবেদক। ইংরেজিতে রিপোর্টার।

বাবুর চেহারার মধ্যে একটা নিষ্পাপ ভাব আছে। গোলগাল মুখ। জোড়া ভুরু। উচ্চতার দিক থেকে তাকে ছোটখাটোই বলতে হবে। বেঁটে মানুষরা বুদ্ধিমান হয়। বাবুও বলা যায়, বুদ্ধি বিক্রি করে খায়।

পত্রিকা অফিসে সহকারী সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকদের কাজকে বলা হয় ডেস্কের কাজ। অন্যদিকে রিপোর্টারদের কাজ হাটে-মাঠে-ঘাটে। এই দুই দলের মধ্যে তাই বাহাস লেগেই থাকে। সাব-এডিটররা ঘরে বসে থেকে রিপোর্টারদের লেখা কাটছাঁট করে। শিরোনাম বদল করে। লেখা বড় করে ছাপা হবে, নাকি ছোট করে, রঙিন নাকি সাদাকালো, এইসব সিদ্ধান্ত নেয়। কাজেই ঐতিহাসিকভাবেই, এবং পৃথিবীব্যাপিই প্রতিবেদকদের সঙ্গে সহ-সম্পাদকদের সম্পর্কটা দা-কুমড়ার মতো। বা আদায়-কাঁচকলায়।

www.Murchona.com suman_ahm@yahoo.com

মাসুদের সঙ্গে বাবুর সম্পর্কটাও অনেকটা সে রকম। ছোট পত্রিকা। স্টাফ বেশি নয়। এই দুইজনের মধ্যেই দ্বন্দ্বটা স্পষ্ট। এই দুইজন আবার দুইজনের ওপর কাজের ব্যাপারে নির্ভরশীল। পরস্পরকে তারা শ্রদ্ধাও করে। আবার পরস্পরকে এক হাত দেখে নেওয়ার জন্যে তক্কে তক্কে থাকে।

তারা দুজন একই ঘরে পাশাপাশি ডেস্কে কাজ করে। ডেস্কের ওপরে দিনের সবগুলো দৈনিক পত্রিকা একসঙ্গে জুতোর ফিতে দিয়ে বাঁধা। এটাকে বলে ডেইলি ফাইল। প্রত্যেক মাসের একেকটা দৈনিক আবার একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। এগুলোকে বলে মান্থলি ফাইল। আর ডেস্কের পেছনে শেলফ ভরা কতগুলো বক্সফাইল। খবরের কাগজের দপ্তর মানে ফাইলের নানা রকমের ব্যবহার। এমনকি কম্পিউটারের ভেতরেও নাকি কতগুলো ফাইল থাকে। এই নিয়ে এদের পিয়ন রাজ্জাকের বিস্ময়ের শেষ নাই। ওদিকে একাউন্টেন্টের রুমে লাল ফিতেয় বাঁধা ফাইল তো আছেই।

পাশের রুমে তাদের সম্পাদক শামীম ভাই বসেন।

বাবু একটা ফিচার স্টোরি লিখে জমা দিয়েছে মাসুদকে। মাসুদ সেটা দেখছে আর তার কপালে ভাঁজ পড়ছে। সে বলে,বাবু, তোমার স্টোরিটা কি ঘরে বইসা লিখছ?

বাবু বলে, কেন মাসুদ ভাই। এই কথা বলতেছেন কেন?

এই যে লিখছ, রোববার সন্ধ্যা। ইস্টার্ন প্লাজায় বড্ড ভিড়। মাসুদ চশমার নিচ দিয়ে চোখে বিরক্তি ফুটিয়ে বলে।

হ্যাঁ। আপনি যদি যান দেখবেন ভিড়ের ঠেলায় ঢুকতে পারবেন না-- বাবু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে।

বেটা। রবিবারে ইস্টার্ন প্লাজা বন্ধ থাকে। মাসুদের মুখে বিজয়ীর ভঙ্গি।

আমি যেদিন গেছি সেইদিন খোলা ছিল। হরতালের পরের দিন খোলা থাকে--বাবু ছাড়বার পাত্র নয়।

এর মধ্যে হরতাল হইল কবে? তুখোর গোয়েন্দার মতো জেরা করে মাসুদ।

ওই যে গতমাসে হইল না একদিন...তারপরে গেছিলাম।

আমি কি তোমাকে গত মাসের স্টোরি করতে বলছি? শ্লেষ মিশিয়ে বলে মাসুদ।

পাশের ঘর থেকে সম্পাদক শামীম ভাই (শামীমুজ্জামান) ইন্টারকমে ফোন করলেন মাসুদকে। শামীম ভাই লোকটা ভীষণ কৌতূহলোদ্দীপক একজন মানুষ। ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্টারেস্টিং চরিত্র। এই লোকের মুখে সারাক্ষণ হাসি লেগে থাকে। তিনি কখনোই রাগেন না। কখনোই কেউ তাকে উত্তেজিত হতে দেখেনি। প্রবল বিপদেও তার মাথা ঠাণ্ডা! জরুরি প্রয়োজনেও কেউ তাকে ছুটতে দেখেনি। হন্তদন্ত হতে দেখেনি। তিনি হলেন ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তিনি হয়তো দুপাটি দাঁত বের করে হাসিমাখা মুখে সবাইকে ডেকে বলবেন, শোনো, আমাকে একটু বেরুতে হবে, আজকে আমার ছোটবোনটা আবার ডেলিভারির সময় মারা গেছে। আমার খুবই আদরের ছোটবোন। বোনটা মারা গেছে, বাচ্চাটা বেঁচে আছে। ভারি সুন্দর হয়েছে দেখতে বাচ্চাটা। ফিরে এসে বাকি কাজটা সারব। কেউ কিছু চিন্তা কোরো না। বলে আবার তিনি হাসবেন। এত ঠাণ্ডা ও অমায়িক ধরনের মানুষ তিনি, কিন্তু তাই বলে তার কোনো কাজ পড়ে থাকে না। হাসিমুখে ঠাণ্ডামাথায় জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করাই তার বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজে বিশেষ করে সাপ্তাহিক পত্রিকার জগতে তাকে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন বলে গণ্য করা হয়।

শামীম ভাই ইন্টারকম তুলে মাসুদের নাম্বারে ডায়াল করলেন।

মাসুদ ধরল। হ্যালো...

শামীম ভাই বললেন, মাসুদ...

সম্পাদক ডেকেছেন, মাসুদ আক্ষরিক অর্থেই কাঁপতে লাগল, জি জি শামীম ভাই...

বাবুরে নিয়া একটু আসো।

জি শামীম ভাই... এক্ষুনি আসতেছি...মাসুদের বুকের কাঁপন তার গলায় ধরা পড়ছে।

ফোন রেখে সে বাবুকে বলল, শামীমভাই কইছে তোমারে কানে ধইরা নিয়া যাইতে... চলো...এইটা মাসুদ বানিয়ে বলল, ডেকে আনতে বললে বেঁধে আনে, মাসুদ সব সময় বাবুর ব্যাপারে এই নীতি মেনে চলে।

বাবু বলল, ডাকল?

মাসুদ বলল, হ্যাঁ। খালি ডাকে নাই। কী কইলাম। কানে ধইরা নিতে কইছে...

বাবু আর মাসুদ তাদের দুই ডেস্কের রুম থেকে চলল সম্পাদকের রুমে।

শামীম ভাই বসে আছেন তার টেবিলে। রুমটা খুবই আধুনিকভাবে ও রুচিসম্মতরূপে সাজানো। পেছনে রনবীর আঁকা একটা ছাগলের ছাপচিত্র। বেশ বড়। ছাগলটা একটা দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। এক পাশে একটা আফ্রিকান মুখোশ। রংদার। একদিকে একটা উইনডো ধরনের এয়ারকুলার ঝিমঝিম শব্দ করে চলছে। শামীম ভাই এসি ছাড়া থাকতে পারেন না। পৌষ মাসের শীতেও তিনি এসি ছেড়ে হাফহাতা শার্ট পরে এই রুমে বসে থাকেন। তার টেবিলটা বেশ বড়। ভদ্রলোক পরিচ্ছন্ন ও শৌখীন। টেবিলের পেছনে নানা রকমের জীবন্ত ক্যাকটাস। টেবিলে দুটো ফোন।

মাসুদ আর বাবু ঢুকল সম্পাদকের কক্ষে।

বসো। শামীম ভাই হাসিমুখে বললেন।

ওরা টেবিলের এক পাশে রাখা চেয়ার দুটো টেনে নিয়ে বসল। অটবির চেয়ার। চেয়ারের গায়ে এখনও কোম্পানির স্টিকার লাগানো রয়ে গেছে।

শামীম ভাই বললেন, আমরা নেক্সট সংখ্যার কভার স্টোরি কী ঠিক করছি?

মাসুদ স্বভাবতই নার্ভাস, সে তোতলাচ্ছে, গ... গ...

বাবু বলল, গণগ্রেপ্তার।

শামীম ভাই বললেন, ভালোই তো। স্টোরি লিখতেছে কে?

মাসুদ বলল, রও...র...

বাবু বলল, রওশন ভাই কাজ করতেছে। অনেক দূর করছে...

শামীম ভাই পিয়নের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, রাজ্জাক রাজ্জাক... রাজ্জাক গেছে কই?

বাবু বলল, লেখা আনতে বাইরে গেছে। কেন কিছু লাগবে।

শামীম ভাই বলল, একটু চা খাইতাম। বসো আমিই বলে আসি...

বাবু বলল, আরে বসেন। আমি যাচ্ছি....

বাবু উঠে গেল চায়ের কথা বলতে। রাজ্জাককে বলা আর দেয়ালকে বলা একই কথা। রাজ্জাক এই অফিসের একটা প্রাগৈতিহাসিক চরিত্র। নরসিংদির ছেলে। একবার একটা লেখা ওর হাতে দিয়ে বলা হয়েছিল কম্পিউটার রুমে দিয়ে আসতে, ও লেখা নিয়ে সোজা নরসিংদি চলে

গেছল। এসেছিল তিনদিন পরে। কী ব্যাপার লেখা নিয়ে কই গায়েব হয়ে গেছলা! স্যার, পকেটে ভরছিলাম। ভুইলা গেছলাম।

তা তিনদিন আসলা না কেন?

প্রথমে ছিল বাংলাদেশের নববর্ষ, পরের দিন আসলটা, ইন্ডিয়ার পয়লা বৈশাখ, তারপরের দিন শুক্রবার, এই কইরা তিনদিন গেল স্যার। রাজ্জাকের বর্ণনা দিতে গেলে সে সাতকাণ্ড রামায়ণ হয়ে যাবে। এই গল্প তাকে নিয়ে নয়।

বাবু চায়ের কথা বলতে গেছে, সম্পাদকের কক্ষে মাসুদ আর শামীমভাই দুজনে বসে আছেন।

শামীম ভাই বললেন, বাবু ছেলেটা ভালোই কী বলো!

মাসুদ বলল, জি ভালো।

শামীম ভাই বললেন, একটু চালাক। না? তুমি কিন্তু দেখে শুনে রাখবা।

মাসুদ বলল, জি...

মাসুদ আর শামীম ভাইয়ের কথা এই পর্যন্তই হয়েছে।

বাবু এসে ঢুকল।

শামীম ভাই বললেন, ঈদ তো এসে গেল, না? ঈদসংখ্যার কী করবা?

এই ধরনের নির্দোষ আলাপ সেরে তারা বেরিয়ে এলো সম্পাদকের রুম থেকে। তাদের সম্পাদক শামীম ভাই সত্যি ভালো মানুষ। নিরহঙ্কার। আর সব বিষয়ে ভীষণ যত্নবান, এমনকি কর্মীদের ব্যক্তিগত সুখে-দুখেও তিনি হাসিমুখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

আবার তারা দুইজন মাসুদ ও বাবু রুমে এসে গেল।

মাসুদ বলল, মিয়া আমি তোমারে আর কত গার্ড দিয়া রাখব? শামীম ভাই তো তোমার উপরে খুব খ্যাপা।

কেন? কী বলে?

আমারে বলে বাবুকে নিয়া খুব মুশকিলে পড়ছি। চারদিক থাইকা ওর এগেনস্টে কম্প্লেইন। স্পটে না গিয়া বানায়া লেখে। এর ওর কাছে টাকা চায়।

কী বলেন। এগুলা বলল?

আরে কত কী বলল। আমি বললাম, শামীম ভাই গরিব মানুষ খালি ওর চাকরিটা খাইয়েন না। শামীম ভাই বলে, তুমি বইলা মাসুদ সহ্য করো। আমি তোমার জায়গায় হইলে করতাম না। এইসব পোলাপান

রাখলে পত্রিকার দুর্নাম। প্রফেশনের বদনাম।

বাবু পাকা অভিনেতা। সে কেঁদে ফেলল। শামীম ভাই এইরকম বলতে পারল। আচ্ছা আমি এক্ষনি জিজ্ঞাসা করতেছি। দাঁড়ান। শামীম ভাই শামীম ভাই....

এই কই যাও। যাও না গিয়া কও না। বাইর কইরা দিবে। খুব রাগারাগি করতেছে আজকা। ফায়ার হয়া আছে...

না আমি যাব।

আরে যাস না। তোর ভয় কি। আমি তো মাথার উপরে তোর বড়ভাই আছি। ঝড়ঝাপ্টা যা আইব সব আমি সামলামু। যাইস না।

বাবু চোখ মোছে। কিন্তু তার মনের মধ্যে অন্য পরিকল্পনা। মাসুদকে কীভাবে জব্দ করা যায়, তার উপায় সে মনে মনে এঁটে ফেলেছে।

শামীম তার রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

বাবু দেখল শামীম ভাই চলে যাচ্ছেন।

শামীমভাই চলে গেলে বাবু অফিসে ঢুকল।

সোজা চলে গেল শামীম ভাইয়ের রুমে।

তার ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করল মাসুদের মোবাইলে। মাসুদ এরই মধ্যে অফিস থেকে চলে গেছে।

বাবু ফোন করল। মাসুদ ফোন ধরল তার মেসে বসে।

হ্যালো...মাসুদ কাঁপছে। শামীম ভাইয়ের অফিসের ফোন নাম্বার মোবাইলের স্ক্রিনে দেখেই তার কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে।

বাবু বলল, মাসুদ আমি শামীম ভাই...বাবু অভিনেতা হিসেবে পাকা। বিভিন্ন লোকের কণ্ঠস্বর নকল করতে তার তুলনা নাই।

শা... মী...ম ভাই সালামালেকুম...

মাসুদ তুমি বাবুরে কী বলছ বলো তো ওতো এসে আমার কাছে কান্নাকাটি করতেছে... আমি তোমাকে কী বললাম....

বাবু আপনারে লাগাইছে নাকি...দেখেন দেখেন তো...

আমি তো তোমারে বলি নি তাই না তুমি বানায়া বানায়া এইসব বললা...

স্যরি শামীম ভাই।

বানাও বানাও আমার নাম দিয়া বানাইবা?

স্যরি শামীম ভাই....

না মাসুদ তুমি বাবুকে কিছু বলতে চাও নিজে নিজে বলো। আমার নাম ব্যবহার করাটা খুব অন্যায় হইছে। এইটা তো সিগনেচার নকল করার মতো, তাই না?

স্যরি শামীম ভাই।

আমাকে স্যরি বলে লাভ নাই। তুমি বাবুকে স্যরি বলবা।

জি শামীম ভাই। আমি আসলে একটু ফাজলামো করছিলাম আর কী!

কাজটা ঠিক করোনি। রাখি।

ফোন রেখে দিয়ে বাবু হা হা হা করে হাসল খানিক। অনেকক্ষণ ধরে।

***

পরের দিন অফিসে মাসুদ গম্ভীর। বাবুও গম্ভীর। দুজনে পাশাপাশি বসে কাজ করছে।

মাসুদ বলল, বাবু। তুমি কাজটা ঠিক করোনি।

বাবু বলল, কোন কাজটা?

তুমি কেন শামীম ভাইয়ের সাথে ব্যাপারটা নিয়া ডিসকাস করতে গেলা। শামীম ভাই আমারে বলল, দুরো মিয়া তোমাকে একটা কথা কইছি, আর তুমি সেইটা বাবুরে লাগায়া দিলা। বাবু মন খারাপ করল না?

কী বলেন। আমাকে তো শামীম ভাই উল্টা বলল। না মাসুদকে আমি কোনোদিনও এইসব বলি নাই। আনো ওকে ডেকে আনো। আমি এখনই ওর মিথ্যা বলা বার করছি।

আরে বুঝো না। মুখ বাঁচাইতে তোমার মুখের উপরে অন্য কথা কইছে আর কী!

আসুক শামীম ভাই অফিসে আসুক। আপনিও যাবেন। আমিও যাবো। আজকাই বোঝাপড়া হয়ে যাবে। আসুক।

মাসুদ হঠাৎ বাবুর হাত ধরে বলল, স্যরি বাবু। তুমি কিছু মাইন্ড কইরো না। শামীম ভাই আমাকে ট্রাস্ট করে যেটা বলছেন সেটা তোমাকে বলা উচিত হয় নাই।

বাবু বলল, না এইভাবে স্যরি বললে হবে না। শামীম ভাই আমাকে

বলছে, মাসুদ বানায়া তোমাকে আমার নাম ভাঙায়া বলছে। এইটা খুব বড় অপরাধ করছে। এইটা... সাইন জাল করার মোতো হইছে।

মাসুদ বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। শামীম ভাই বলে নাই। যাও হইছে। তুমি খুশি।

আমি তো মাসুদ ভাই আপনার উপরে সব সময় খুশি। আপনি আমার ইমেডিয়েট বস। তাই না। আপনার উপরে তো খুশি থাকতেই হবে। কিন্তু শামীম ভাই। আপনি ওনাকে স্যরি বলেন। খুব খেপে আছে...

বলতে বলতেই শামীমভাই ওই রুমের দরজায় এসে দাঁড়ান।

দুজনে থেমে যায়।

শামীমভাই আপন মনেই বিড়বিড় করে সোজা নিজের গিয়ে রুমে বসেন।

বাবু বলে, যান গিয়া পায়ে ধরে স্যরি বলেন। উনি কিন্তু খুব সিরিয়াস।

মাসুদ বলে, যাবো।

বাবু বলে, হ্যা। অবশ্যই যাবেন। যান।

মাসুদ ওঠে। সাহস সঞ্চার করে। বুকে থুতু দিয়ে যায় শামীম ভাইয়ের ঘরে।

বাবু বের হয়ে একটা মটর সাইকেল স্টার্ট দেয়।

মাসুদ খুবই নার্ভাসস্বরে বলে, শামীম ভাই আসব।

আসো। কী অবস্থা। ঈদসংখ্যা?

শামীম ভাই আমি স্যরি।

কেন?

বাবুকে মিথ্যা বলাটা আমার উচিত হয় নাই।

কোন মিথ্যার কথা বলছ?

ওই যে কালকে।

ওই যে কালকে?

ওই যে কালকে আপনি আমাকে ফোন করলেন না?

কখন?

কালকে রাতে আপনার সাথে আমার ফোনে কথা হলো না?

কোন ফোনের কথা বলছ বলো তো। আমি তো কালকে কথা বলছি... না তো তোমার সাথে তো বলি নাই...

ওই যে আমি বাবুকে আপনার নাম করে বলছি আপনি খুব রাগ ওর উপরে...

কেন তুমি আমার নামে ওকে ঝাড়ি দিতে গেছ...

সেই জন্যে স্যরি বলতে এসেছি...

আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না মাসুদ।

আমি যে বাবুকে বলছিলাম না আপনি ওকে সন্দেহ করেন, সেই কারণে আপনি বললেন না ওর কাছে মাফ চাইতে...

কখন?

ওই যে কালকে আপনি ফোন করলেন।

না তো আমি তো তোমাকে ফোন করি নাই।

সন্ধ্যায়। এই যে আমার মোবাইলে আছে কল রেজিস্টারে।

আমি কিছুই বুঝতেছি না।

আমি মনে হয় বুঝছি। আমি আসি। মাসুদ বেরিয়ে গেল। বাবু তাকে জব্দ করল এইভাবে! ঠিক আছে, তাকে আসতেই হবে। তখন সে বুঝবে, কত গমে কত আটা!

পরের দিন অফিসে বাবু গম্ভীর হয়ে কাজ করছে। মাসুদও গম্ভীর হয়ে কাজ করছে।

মাসুদ বলে, এই লেখা কই?

দিছি তো। এই তো... মাসুদের টেবিলেই লেখাটা ছিল। বাবু মাসুদকে লেখাটা এগিয়ে দেয়।

মাসুদ মোটামুটি না দেখেই বলে, এইটা কোনো লেখা হইছে। এইটা কী লিখছ? মাসুদ রেগে ছিঁড়ে ফেলে দেয় লেখাটা।

পাশের রুম থেকে পেস্টার, কম্পিউটারের লোক, আর অন্য স্টাফরা এসে উঁকি দিয়ে দেখে। রাজ্জাক আসে। বলে, স্যার, কাগজ কুটিকুটি কইরা ছিড়েন কেন? ফেইলা দেওয়া কাগজ টুকাইয়া কতজনে বাঁইচা আছে। আপনেরা তাগো দিকে তাকাইবেন না।

মাসুদ বলে, এই, সব যাও এখান থেকে। কীসব লিখছে একটা ছাগল-পাগলে। মেজাজ ঠিক নাই। যাও সব।

বাবু বলে, আপনি ঝাড়ি মারতেছেন কেন?

ছাগল দিয়া হালচাষ হয় না। এইসব কী লিখছ। একটা ছাগলও এর চাইতে ভালো লেখে।

বস। শামীম ভাই আপনেরে ঝাড়ি দিছে এইটা তো আপনার দোষ তাই না। আমার উপরে রাগ ঝাড়তেছেন ক্যান।

তুমি আমারে শামীম ভাই সাইজা ফোন দিছো। বুঝছ আমি টের পাই নাই। আমি পুরাটা রেকর্ড কইরা শামীম ভাইরে শুনাইছি। শামীম ভাই তোমারে দেইখো... আইজকাই চাকরি শেষ...

বাবু উঠে যায় পাশের রুমে।

পাশের রুমে চার ৫ জন কর্মী মাসুদের রাগারাগি দেখে এসে কেউ কম্পোজ করছিল। কেউ করছিল পেস্টিং।

তারা ধরে বাবুকে, এই বাবু ভাই কী হইছে বলেন তো।

বাবু হাসতে থাকে, আরে বইলেন না। আমারে ঝাড়ি দেয়। শামীম ভাই নাকি কইছে আমি টাকাপয়সা খাই। আমি তো জানি শামীম ভাই কয় নাই। আমি করছি কী, শামীম ভাইয়ের ফোন থাইকা ফোন দিছি। আমি কী বলব, উনি বলে, শামীম ভাই বলেন শামীম ভাই... আমাকে শামীম ভাই ভেবে সব স্বীকার করল। স্যরি বলল। আমি বুঝে ফেললাম ঘটনা কী? আমি শামীম ভাই সেজে বললাম, আমার কাছ থেকেও মাফ চাইবা, বাবুর কাছ থেকেও মাফ চাইবা।

এখন আমার কাছে তো মাফ চাইছেই। শামীম ভাইয়ের কাছেও গেছল মাফ চাইতে। গিয়া বুঝছে ধরা খাইছে এখন রাগ দেখাইতেছে...খুক খুক করে সশব্দে হেসে উঠল বাবু।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। খিকখিক...

মাসুদ ওঠে। এই ঘরে আসে।

সবাই চুপ।

মাসুদও প্রথমে গম্ভীর। তারপর হাসে।

মাসুদ হেসে বলে, এই শালা বাবু কী রকম ডেঞ্জারাস। দেখছ সবাই। আমারে এই হাটে বেইচা ওই হাটেই কিনতে পারব। বাপরে...

বাবুও হাসে। মাসুদও হাসে। সবাই হাসে। সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ পত্রিকা অফিসে বেশিক্ষণ গম্ভীর হয়ে কেউ থাকতে পারে না।

****

মাসুদ তার বাসায়। মেস বাড়ি। চিলেকোঠার একটা রুম ভাড়া নিয়ে মাসুদ ভালোই আছে। ভালো বেতন পায়। একলা মানুষ। কোনো বদভ্যাস নাই। পান দোক্তা, চা-সিগারেট, মদ-গাঁজা কিচ্ছু না। এই

নিয়েও বাবু তাকে খেপায়। মাসুদ ভাই, দুপুরে খালি টোস্ট বিস্কুট খান কেন। গলায় আটকাইয়া মইরা যাইবেন তো!

মাসুদ টিভি দেখছে।

টিভিতে দেখাচ্ছে মডেল সারাহকে।

মাসুদ মোবাইলটা নিল। বাবুকে কল দিচ্ছে। বাবু তার বাসায়, সেটাও মেস, ভাত খাচ্ছে।

বাবুর মোবাইল বেজে উঠল।

জি মাসুদ ভাই।

বাবু। টিভিটা ছাড় তো। ২২ নম্বর চ্যানেল। চ্যানেল আই।

দাঁড়ান একমিনিট। হ। ছাড়ছি।

একটা মাইয়ারে দেখায় না। মাইয়াটা কেডা?

আরে ওতো সারাহ।

নতুন নাকি।

না নতুন না। ক্যান।

নেক্সট ইসুতে একটা ইন্টারভিউ করো না!

হঠাৎ।

আরে ভালো করতেছে একটা মেয়ে তার ইন্টারভিউ করতে হবে না। কচু বুঝো কাগজের!

আচ্ছা আপনি বলছেন। করব।

অফিসে নিয়া আইসো। আমাদের স্টুডিওতে ছবি তুইলো। বুঝছ। আবার মেয়ের সাপ্লাই দেওয়া ছবি ছাইপো না।

না না। তাতো করবই না। আমাদের স্টুডিও আছে কী করতে!

গুড। আসলে আমি ভাইবা দেখলাম তুমি ছেলেটা খারাপ না। একটু ফাজিল আর কী!

আপনাদের দোয়া। বাবু হাসে।

বাবু সারাহকে অফিসে নিয়েও আসে। ফটো-সেশনও করে। কিন্তু সারাহ আসে সেইদিন, যেদিন মাসুদের ছুটি।

পরের দিন বাবুর টেবিলের কম্পিউটারে ফটোগ্রাফার কবির সারাহর ছবিগুলো দেখাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি! ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়েছে, সেটা সরাসরি কম্পিউটারে দিয়ে দিয়েছে কবির। এখন ইচ্ছামতো ছবি বাছাই করো। প্রিন্ট করারও ঝামেলা নাই!

বাবু বলে, এইটা ভালো হইছে। এইটা জোশ হইছে। এইটা কী তুলছ?

কবির বলে, যেইটা লাগবে না ডিলিট করে দিলাম। ডিজিটাল ক্যামেরা তো।

মাসুদ ঢোকে।

বাবু বলে, মাসুদ ভাই মাসুদ ভাই আসেন আসেন। আপনার সারাহকে দেখেন। কী পোজ দিছে।

মাসুদ বলে, তোমাকে না বলছি বাবু বাইরের ছবি আমরা ছাপব না। অফিসে এনে স্টুডিওতে ছবি তুলবা।

কবির বলে, অফিসে আসছিল তো। আমাদের স্টুডিওতে তোলা।

মাসুদ বলে, কবে আসছিল।

বাবু জানায়, কালকে।

মাসুদ বলে, কালকে আমি কোথায় ছিলাম।

বাবু বলে, আপনার অফ ডে ছিল।

মাসুদ বলে, আমার ডে অফ। দেখছ দেখছ। আমি বললাম মেয়েটারে নিয়া আসো। প্রমিজিং মেয়ে। আমি তারে দুইটা কোশ্চেন করব। আর তুমি এমন দিনে আনলা যেইদিন আমার অফ ডে। এইটা কোনো কাজ করলা।

মাসুদ রেগে-মেগে অন্য দিকে চলে গেল।

আবার এসে বলল, শোনো এই ইন্টারভিউ ছাপা হবে না।

বলে আবার চলে গেল।

***

মাসুদ গেছে সম্পাদক শামীম ভাইয়ের সামনে। কতটা মরিয়া হয়েছে সে, সারাহকে অফিসে এনে তার সঙ্গে পরিচয় না করানোর ঘটনা তাকে কতটা বেপরোয়া করে তুলেছে, এটা হলো তার প্রমাণ। পারতপক্ষে সে শামীম ভাইয়ের সামনে যায় না। গেলেও হাত না কচলে ও তোতলামি বন্ধ না করে সে কোনো কথা বলতে পারে না।এখন সে অবলীলায় বলে যাচ্ছে, শামীম ভাই। বাবুকে নিয়ে তো আর পারা যাচ্ছে না।

শামীম ভাই বলেন, কেন। কী হইছে? শামীম ভাইয়ের মুখে ক্লোজআপ টুথপেস্ট মার্কা হাসি।

আর বলবেন না। আরে কতগুলি উঠতি মডেল আছে না, তাদের কাছ থেকে কী কী সব... বুঝলেন না... ফ্যাসিলিটি নিয়া তার এমন ইন্টারভিউ করছে, মনে হচ্ছে রানী মুখার্জির ইন্টারভিউ নিছে। সব দুই নম্বর।

কী বলো তুমি? হাসিমুখে বিস্ময় প্রকাশ করেন শামীম ভাই।

শামীম ভাই। আমি কিন্তু এইবার ভেরি স্ট্রিক্ট। ওর দুই নম্বরি বন্ধ করব। মেয়েরা ফোন করে করে আমাকে বাবুর নামে অনেক কম্প্লেইন করছে। বাবু নাকি বলে চলো এক সাথে লাঞ্চ করি। এই সব...

না মাসুদ। তুমি একটু এলার্ট থেকো। আমাদের কাগজের একটা সুনাম আছে। আমরা নিউট্রাল। আর অনেস্ট। অনেস্টির প্রশ্নে কমপ্রোমাইজ করা যাবে না।

থ্যাংক ইউ শামীম ভাই।

মাসুদ উঠে আসে।

বাবু ফোনে। পাশে মাসুদ। একই ঘরে।

বাবু ফোনে কথা বলছে সারাহর সাথে। সারাহ তার বাড়িতে।

বাবু বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই সপ্তাহেই ছাপা হবে।

সারাহ বলে, গত সপ্তাহেও তো একই কথা বলেছিলেন।

আরে গত সপ্তাহে মাসুদ ভাইয়ের মেজাজ খারাপ ছিল। এই সপ্তাহে ঠিক আছে। ন্যাও তুমি কথা বলো। মাসুদ ভাই তোমাকে অনেক পছন্দ করেন। মাসুদ ভাই কথা বলেন। বাবু ফোন এগিয়ে দেয়।

মাসুদ বলে, কে?

বাবু বলে, সারাহ।

মাসুদ বলে, এইসব দুই নম্বরি কাজে আমি নাই। আমি কেন কথা বলব। কক্ষনো না। বলে দাও ইন্টারভিউ ছাপা হবে না।

বাবু বলে, স্যরি সারাহ । মাসুদ ভাই ব্যস্ত। আপনাকে তো খুব পছন্দ করে। উনিই আপনাদের বাসায় যাবেন।

বাবু ফোন রেখে দেয়।

মাসুদ ধরে বাবুকে, কেন কইলা তুমি তারে আমি তার বাসায় যামু। আমি গেছি কোনোদিন কোনো নায়ক নায়িকার বাসায়। আমি কি তোমার মতো দুই নম্বর?

কী কন না কন। মানে কী এইসব কথার?

শোনো। যতই ফুসুর ফাসুর করো। আমি এই ইন্টারভিউ ছাপব না। ব্যাস।

কেন ছাপবেন না কেন?

ছাপব না।

আমি পেস্টিং করে দিব।

কী? এত বড় সাহস।

দিব।

এই পাতার এডিটর কে। তুমি না আমি।

আমি শামীম ভাইয়ের পারমিশন নিব।

শামীম ভাই আমাকে মানা করছে। বলছে বাবু একটা দুই নম্বর। ওর কাজকর্মের উপরে নজর রাখো।

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি শামীম ভাইয়ের কাছে।

যাও দেখো কী বলে।

বাবু কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে শামীমের রুমে ঢুকল। কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই চোখে পানি আনার বিরল প্রতিভা আছে বাবুর।

শামীম ভাই টেবিলে বসে কারো সাথে ফোনে কথা বলছেন।

শামীম ভই বলে চলেছেন, না। রাজনীতিই তো আসল। ওইটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

বাবু রোদন সহকারে বলল, শামীম ভাই।

শামীম ভাই বললেন, বাবু। একমিনিট। আমি ফোনটা সারি।

বাবু কাঁদে।

শামীম ভাই ফোন রেখে বলেন, কী ব্যাপার বাবু। কী হইছে?

আপনি সারাহর ইন্টারভিউ না ছাপাতে বলছেন।

হ্যাঁ। শামীম ভাই হাসলেন। এই ধরনের কোনো নির্দেশ তিনি দেননি। ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছে, বুঝে নেওয়ার জন্যে তিনি বললেন, তোমার কী এমন ইন্টারেস্ট।

আমার ইন্টারেস্ট কী। আমি কষ্ট করে ইন্টারভিউ করছি। এখন আমার মুখ থাকে কই।

এই জন্যে তুমি কানতেছ।

না এই জন্যে না। মাসুদ ভাই বলতেছে আমি নাকি স্টারদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ইন্টারভিউ করি। এতো বড় অপমান। আমার বুড়া মায়ের কসম...

এত কিছু করতে হবে না। একটা কথা উঠছে। আমরা একটু দেখি ব্যাপারটা ঠিক কিনা।

আমি এই কাগজের জন্যে কত কী করলাম। আর আজকে....

কেঁদো না। কাঁদার মতো কিছু হয় নাই। ছাপব না বলিও নি। আমি আরেকজনকে একটু ইনভেস্টিগেট করতে দিয়েছি। দেখি। ও কী বলে।

আমাকে কেউ এত বড় অপমান করেনি। বাবু বলে আর কাঁদে।

শামীম ভাইয়ের মোবাইলে ফোন আসে।

শামীম ভাই 'বস আসতেছি আসতেছি' বলে বেরিয়ে যান।

সাথে সাথে বাবু চোখ মুছে হাসে।

মাসুদের সামনে দিয়ে শামীম ভাই যাচ্ছেন। তিনি বলেন, মাসুদ। দাও ছাপায়া ইন্টারভিউটা।

মাসুদ বলে, না শামীম ভাই। ছাপা যাবে না।

আচ্ছা দেখো যা ভালো মনে করো। বলে শামীম ভাই বেরিয়ে যান।

সেইটা আড়াল থেকে বাবু শোনে।

এইটার একটা বিহিত করা দরকার। আমি একটা সাক্ষাৎকার নিলাম, আর মাসুদ ভাই সেটা ছাপবে না! ঠিক আছে, মাসুদ ভাইকে কীভাবে ধরা খাওয়াতে হয়, আমার চেয়ে কেউ সেটা ভালো জানে না। সে একটা মারাত্মক ফন্দি মনে মনে এঁটে ফেলে।

বাবু মোটর সাইকেলে উঠে একটানে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে যায়। দোকানের ফোন থেকে ফোন দেয় মাসুদের মোবাইলে।

মাসুদ বলে, হ্যালো।

বাবু বলে, মাসুদ রহমান সাহেব বলছেন?

জি।

আপনি তো সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণের এসিস্টান্ট এডিটর। তাই না?

জি।

আমি ডিবি অফিস থেকে বলছি। এসআই কালাম উদ্দিন।

জি বলেন।

আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে একটা লিখিত কম্প্লেইন জমা পড়েছে। আপনাকে একটু আসতে হবে।

কোথায়?

আমাদের অফিসে।

কখন যেতে হবে? মাসুদ তোতলাতে থাকে। তার হাতের তালু দিয়ে কুলকুল করে ঘাম বেরুচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

এখনই। বাবু গম্ভীর গলায় বলে।

আচ্ছা কী ধরনের কম্প্লেইন জানতে পারি।

আসেন। আসলেই সব জানতে পারবেন।

আপনাদের অফিসটা যেন কোথায়।

ঠিকানাটা লিখে নেন।

বাবু মডেলকন্যা সারাহর বাসার ঠিকানাটা দিয়ে দেয়।

মাসুদ ফোন রেখে হাঁপাতে থাকে। তার বুক ধড়পড় করে কাঁপছে। সে এক গেলাস পানি ঢেলে নিয়ে খায়।

কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় ব্যাপারটা নিয়ে। কে তার নামে কম্প্লেইন করতে পারে? করবেটাই বা কেন? ডিবি অফিসার! বাপরে খুবই মারাত্মক জিনিস। কিছুদিন আগে ডিবি অফিসের পানির ট্যাংকে গলিত লাশ পাওয়া গেছে। এর আগে রুবেল নামের একজনকে ওরা লাইটপোস্টের সঙ্গে মাথা ঠুকিয়ে মেরেছে।

তার কি ডিবি অফিসে যাওয়া উচিত হবে? গেলে কি আর সে ফিরতে পারবে?

ওরা কি জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় অনেক মারধর করে? একজন প্রাক্তন মন্ত্রী কাম আমলার পশ্চাদ্দেশ দিয়ে নাকি ওরা সেদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিয়েছিল!

মাসুদ মোবাইলে ফোন দেয় বাবুকে ।

বাবু ভেজা বেড়ালের মতো বলে, জি মাসুদ ভাই।

বাবু। শোনো। একটা সমস্যা হইছে। ডিবি অফিস থেকে ফোন করছিল।

কে?

এস আই কালাম উদ্দিন।

আরে খবিস লোকটা।

চিনো তুমি।

আছে একজন।

আমারে তো ডিবি অফিসে আসতে কয়।

ক্যানো। আগেই যাইয়েন না। বাপরে।

যাইতে নিষেধ করো?

হ। বুঝলেন না। পানির ট্যাংকে লাশ পাওয়া গেছল না?

কী করি বলো তো।

আপনি এক কাজ করেন। শামীম ভাইকে ফোন দেন। শামীম ভাইয়ের অনেক কানেকশন।

হ হ। ঠিক কইছ। শামীম ভাইরে ফোন দেই।

বাবু সাথে সাথে আবার টিএন্ডটির ফোন তুলে ফোন দেয় মাসুদকে।

হ্যালো মাসুদ রহমান সাহেব।

মাসুদ বলে, জি।

বাবু বলে, এস আই কালাম উদ্দিন বলছি। আমরা আপনার গতিবিধির ওপরে নজর রাখছি। আপনি কাকে মোবাইলে ফোন দিলেন।

না মানে আমার একজন কলিগকে।

আপনি আমাদের অফিসে আসতে ভয় পাচ্ছেন কেন। সরকারি অফিসে কারো কোনো ক্ষতি হয় না তো।

না মানে আমার এডিটরকে তো আমার জানাতে হবে।

তা জানান না জানান। কিছু যায় আসে না। কারণ যে সমস্যাটা হয়েছে সেটা আপনার পারসোনাল। অফিসিয়াল না।

না তবু আমি আমার এডিটরকে জানাব।

আচ্ছা জানান। কিন্তু মনে রাখবেন। হাফ এন আওয়ারের মধ্যে আসতে হবে।

বলে বাবু ফোন রেখে দেয়।

মাসুদ ফোন করে শামীমকে। মোবাইলে। শামীম ভাই। আপনি ব্যস্ত। এক মিনিট কথা বলা যাবে?

শামীম ভাই বলেন, বলো।

ডিবি অফিস থেকে ফোন করছিল। আমার কী একটা পারসোনাল ব্যাপারে ওরা কথা বলতে চায়। ডিবি অফিসে যেতে বলতেছে। যাবো?

যাবা। যাও।

আপনার কেউ আছে পরিচিত।

তুমি যাও। আমি দেখতেছি।

আপনার ভরসায় যাইতেছি তাইলে।

আচ্ছা যাও।

মাসুদ ফোন রেখে রেডি হয়ে বের হয়।

ডিবি অফিসে শামীম ভাইয়ের একজন পরিচিত আছে, অনেক উঁচু পোস্টে, তাকে ফোন করেন শামীম ভাই। হ্যালো হাসান ভাই, আপনাদের অফিস থেকে আমার এসিস্টান্ট এডিটর মাসুদ রহমানকে কেন ডেকে পাঠিয়েছে। ও রওনা হয়েছে। আমি যেতে বলেছি। একটু দেখবেন তো। জি....

মাসুদ স্কুটার ছেড়ে দিয়ে বাড়ি খুঁজছে। শেষে একটা বাড়ির নম্বর মিলে যায়।

এটা তো আসলে মডেল সারাহর বাসা। মাসুদ তো সেটা জানে না।

সারাহ তখন বাবার সাথে বসে টিভি দেখছিল।

বেল বাজল।

বেল টিপছে মাসুদ। সারাহদের বাসার গেটে।

সারাহর বাবা দরজা খুললেন। তিনি রাশভারি ধরনের লোক। পুরুষ্ট সাদাপাকা গোঁফ। কালো ফ্রেমের চশমা চোখে।

সারাহর বাবা বলেন, কাকে চাই?

মাসুদ বলে, সালামালেকুম। আমি মাসুদ রহমান। সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ পত্রিকার এসিস্টান্ট এডিটর। আমার আসার কথা...

সারাহর বাবা বলেন, আসেন ভেতরে আসেন।

মাসুদ ভেতরে যায়। সারাহর বাবার সামনে একটা খবরের কাগজ। তিনি সোফায় বসে খবরের কাগজটা হাতে তোলেন।

মাসুদ তো নিশ্চিত, ইনিই ডিবি অফিসার। সে বুঝতে পারে না, এখন তার কী করা উচিত। শেষে সে সাহস সঞ্চয় করে বলে, আপনাদের এখানে নিয়ম কী, আমি কি বসব, নাকি দাঁড়িয়ে থাকব!

বসেন।

মাসুদ বসে।

সারাহর বাবা পত্রিকা থেকে মুখ না তুলে বলেন, আপনি কতদিন থেকে পত্রিকাতে আছেন।

শুরু থেকে।

শুরু কবে হলো?

এই তো। ২০০১-এ।

বাড়ি কোথায় আপনার?

সৈয়দপুর।

পড়াশোনা করেছেন কোথায়।

জগন্নাথে।

সাবজেক্ট।

বাংলা।

জগন্নাথে বাংলা পড়ায়। এই রকম একজনের নাম বলেন তো।

আমাদের সময়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ ছিলেন। মমতাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন।

হুঁ। আমার এক বন্ধু ছিল। কায়েস। চিনেন।

না। মাসুদ ভয়ে ভয়ে বলে, না চিনলে অসুবিধা হবে?

আপনার বাসা কোথায় ঢাকায়?

রাজাবাজার।

ওইখানে একটা খুন হয়েছে পরশু না?

আমি খুব ভালো ছেলে। আমি খুনখারাবি করিনি।

আপনি করেছেন এটা তো আমি বলিনি। একটা খুন হয়েছে। জানেন না?

না তো বিশ্বাস করেন আমি কিছু জানি না। একটু পানি পাওয়া যাবে?

পানি। আচ্ছা বসেন। আমি পানি আনছি।

বাবা ভিতরে যান। সারাহকে না পেয়ে নিজেই একটা ভরা বোতল আর গেলাস আনেন। এসে দেখেন মাসুদ চলে যাবার পথ খুঁজছে।

বাবা বলেন, কই যাও?

মাসুদ চমকে ওঠে। না না কোথাও না। আমি পালাচ্ছি না। এই তো আছিই।

তোমার পানি।

জি পানি। মাসুদ এক বোতল পানি খেয়ে ফেলে।

বাবা বলেন, রাজাবাজারে খুন হয়েছে এ বি খান। তোমাদের কাগজে ওটা ছাপা হয়নি?

না তো।

কেন ছাপা হয়নি কেন। তোমরা ক্রাইম নিউজ কাভার করো না।

না মাঝেমধ্যে করা হয়।

তোমাদের ক্রাইম দেখে কে?

না। বিশ্বাস করেন আমার সাথে কোনো ক্রিমিনালের কখনও পরিচয় ছিল না। আমি একটু নার্ভাস ধরনের মানুষ তো।

সারাহর সাথে তোমার কতদিনের পরিচয়।

বেশিদিনের না। আসলে এইসব মডেল ফডেলদের সাথে পরিচয় রাখা বিপজ্জনক। নানা ধরনের গ্যাং-এর সাথে ওদের ওঠাবসা থাকে তো।

কী? বাবা গর্জে ওঠে, সারাহর সাথে গ্যাং-এর পরিচয় আছে? কোন গ্যাং?

বিশ্বাস করুন। ডিবি স্যার। আমি কিছু জানি না।

ডিবি স্যার? এর মানে কী?

আমার বাথরুম পাইতেছে। বাথরুমটা কোথায়?

কিসের বাথরুম? তুমি আমার মাথায় রক্ত চড়ে দিয়েছ! সারাহর সাথে কোন কোন ক্রিমিনালের পরিচয় আছে তোমাকে বলতেই হবে।

আমি জানি না ডিবি স্যার। বাথরুমটা কই?

বাথরুম? সারাহর সঙ্গে কোন গ্যাং-য়ের পরিচয় আছে আগে বলো।

সব বলব। আগে বাথরুম...বাথরুম না গেলে আমি এখানেই সেরে ফেলব। প্লিজ...বাথরুমটা?

আচ্ছা আসো।

বাথরুমে ঢোকে মাসুদ।

ততক্ষণে সারাহ বাইরের ঘরে এসেছে। তার বাবা একটু ভেতরে গেছে। মাসুদ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

সারাহ বলে, আপনি মাসুদ ভাই না?

মাসুদ ভাবে, শালা কোন কেসে ফাঁইসা গেলাম। ডিবি খাটাসরা দেখি সারাহরেও ধইরা আনছে।

সারাহ আবার বলে, আপনি মাসুদ ভাই না?

মাসুদ বলে, আমি আপনেরে চিনি না। এই আপনে আমার নাম জানলেন কেমনে?

এবার বাবা আসেন।

মাসুদ বলে, বিশ্বাস করেন ডিবি স্যার এই মেয়েরে আজকে আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। এ কে এর নাম কী কিছুই আমি জানি না।

সারাহ বলে, আপনি মাসুদ ভাই না?

মাসুদ বলে, আমি আপনেরে চিনি না। এই আপনে আমার নাম জানলেন কেমনে?

সারাহ্ বলে, মাসুদ ভাই, আমি সারাহ্।

মাসুদ বলে, আমি আপনেরে চিনি না।

বাবা বলেন, সারাহ্ বস তোর সাথে কথা আছে।

বাবা বলেন, সারাহ । বলো তোমার সাথে কোন কোন ক্রিমিনালের পরিচয় আছে?

সারাহ্ বলে, এইসব কী কথা?

বাবা বলেন, এই মাসুদ সাহেব বলেছেন তোমার সাথে অনেক গ্যাংস্টারের পরিচয় আছে।

সারাহ বলে, মাসুদ ভাই। আপনি এইসব বলেছেন?

মাসুদ বলে, বিশ্বাস করুন, ডিবি স্যার। এই মেয়ের সাথে আমার কোনো ঘনিষ্ঠতা নাই। শুধু পত্রিকা অফিসে একদিন দেখা হইছে।

সারাহ্ বলে, ডিবি স্যার? মাসুদ ভাই কী বলছেন?

মাসুদ বলে, এইটা ডিবি অফিস না?

সারাহ্ বলে, কী বলেন।

মাসুদ বাবাকে দেখিয়ে বলে, উনি ডিবি অফিসার না?

সারাহ্ বলে, উনি আমার বাবা।

মাসুদ বলে, আপনার বাবা কি ডিবি অফিসার?

সারাহ্ বলে, না। কী বলে।

মাসুদ বলে, এই শয়তানিটা কে করল?

সারাহ্ হাসে। যেই করুক। হেভি মজা হইছে।বাবা তুমি কি মাসুদ ভাইকে ডিবি অফিসারের মতো ইন্টারোগেট করেছ নাকি। হা হা হি হি হি।

বাবা বলেন, তোমরা গল্প কর। আমি আসি।

সারাহ্ বলে, মাসুদ ভাই। আপনি বাবাকে ডিবি অফিসার ভাবছেন।

মাসুদ বলে, কে এই ফাজলামোটা করল বলেন তো। আপনাদের বাসায় পাঠাইল। নিশ্চয়ই বাবুর কাজ। বাবুকে আজকে দেখেন কী করি। দাঁড়ান।

সারাহ্ বলে, মাসুদ ভাই আপনাকে আমি কত পছন্দ করি আপনি জানেন?

মাসুদ বলে, আমাকে পছন্দ করেন। আমাকে পছন্দ করার কী হলো?

আপনি যে উইকলি কলামটা লেখেন, এইটা পড়লে মনে হয়, মনে হয়, এই রকম একটা রোমান্টিক লোকের সাথে যদি ফ্রেন্ডশিপ করা যেত।

আপনি আমার কলাম পড়েন?

পড়ি মানে? গিলি। আপনি বসেন আমি চা এনে দিই।

চা লাগবে না। আমি যাই।

সারাহ তাকে হাত ধরে বসায়-আরে বসেন তো।

***

ডিবি অফিসে বিশাল হৈচৈ। তাদের বড়কর্তা হাসান সাহেব সবাইকে তটস্থ করে ফেলেছেন। সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ পত্রিকার সম্পাদক শামীম সাহেব হাসান সাহেবের ঘনিষ্ঠ। তার পত্রিকার সহকারী সম্পাদককে ডিবি অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অথচ ডিবি অফিসের কেউ ব্যাপারটা জানে না? ঘটনা কী?

ঘটনা তদন্তের জন্যে দুজন ঝানু গোয়েন্দাকে সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

***

রাত তখন ১০টা হবে। একটু আগে সারাহর বাসা থেকে ফিরেছে মাসুদ। তার মনটা উচাটন। সারাহ মেয়েটা যে এত ভালো, এত মিশুক সে জানতই না। আর পড়াশোনা করা মেয়ে। তার কলাম সারাহর পুরা মুখস্থ। মাসুদ মুগ্ধ।

মুগ্ধতা আরো বেড়ে যায়, টিভিতে যখন সারাহর একটা বিজ্ঞাপন দেখাতে থাকে, আর সেটার দিকে ড্যাবডেবে নয়নে মাসুদ তাকিয়েই থাকে।

টুংটাং। দরজায় কড়া নাড়ারও শব্দ। এত রাতে তার দরজায় কে?

সে বলে, কে?

আমরা ডিবি অফিস থেকে এসেছি।

কে হতে পারে? ডিবি অফিসের লোক? নাকি বাবু ইয়ারকি করতেছে?

মাসুদ কী যেন ভেবে দরজা খোলে। তার সামনে দুজন অপরিচিত লোক।

আপনারা কে? মাসুদ বলে।

ডিবি অফিস থেকে আসছি। ওরা জানায়।

সত্যি ডিবি অফিস থেকে আসছেন? নাকি আবার কেউ ফাজলামো করতেছে?

লোক দুটো আইডি কার্ড বের করে দেখায়। সত্যিকারের ডিবি অফিসার তারা। তারা বলে, খুব জরুরি, উপরের অর্ডার, আপনাকে আমাদের সাথে আসতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মাসুদের প্যান্ট ভিজে যায়, পা বেয়ে হিসু গড়াতে থাকে।

***

ডিবি অফিসের নাম করে কে মাসুদকে ফোন করেছিল। ডিবি অফিসার দুজন সেটা তদন্ত করছে। ব্যাপারটা ভীষণ সিরিয়াস। হাই লেভেলের প্রেসার। কোন নাম্বার থেকে ফোন এসেছিল মাসুদের ফোনে, সেটা তারা চেক করে।

তারপর সেই ফোনে ফোন দিয়ে তারা জানতে পারে, ওটা একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকান। সেই দোকানে গিয়ে তারা জানতে চায়, কে তাদের ফোন ব্যবহার করেছিল।

তারা জানায়, সাপ্তাহিক পর্যবেক্ষণ পত্রিকার সাংবাদিক বাবু সাহেব করেছিলেন।

বাবু নিজের ঘরে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ তার ঘুম ভেঙে দেয়।

বিরক্ত হয়ে সে দরজা খুলতে যায়। কে?

আমাদেরকে ডিবি অফিস থেকে পাঠাইছে। দরজা খোল।

আমাকে বোকা পাইছ?

খোল!

বাবু দরজা খোলে। দু'জন পুলিশ। বাবুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

***

বাবু থানা হাজতে। জায়গাটায় ভীষণ মশা। আর দুর্গন্ধ। একটা পকেটমারকে ধরে এনে রাখা হয়েছে। সে ভীষণ কাতরাচ্ছে।

আরো বেশি রাতে তিন খুনের আসামী পিঠকাটা জয়নালকে ধরে আনে পুলিশ। তাকে দেখে পুলিশের কনস্টেবলরাই সালাম দিতে থাকে।

বাবুকে দেখে জয়নাল বলে, এই কী করছস? খুন না রেইপ? আয় এদিকে আয়, পা টিপ।

বাবুর উপস্থিত বুদ্ধি অতুলনীয়। সে বলে, আমি পত্রিকার রিপোর্টার, রাতের থানা হাজত নিয়া লিখতেছি, সব থানাতেই একরাত করে থাকব, আজকে এই থানা।

কী লিখবি। পিঠকাটা জয়নাল নিয়া সাংবাদিকেরা কম লেখে নাই। করতে পারছে ঘন্টা। আয় পা টিপ।

বাবু ওই রাতেই ফোন দেয় শামীম ভাইকে। শামীম ভাই, দেখেন তো আমাকে থানায় ধরে আনছে। আজাইরা।

শামীম ভাই বলেন, ডিউটি অফিসারকে ফোনটা দাও।

ডিউটি অফিসার বলে, স্যার...

শামীম ভাই জিজ্ঞেস করেন, আমার রিপোর্টারকে ধরে এনেছেন ক্যান?

'বহুত আপার লেভেল থাইকা তদ্বির আছে স্যার। আমাদের বড় স্যার হাসান স্যারের অর্ডার আছে। এনারে একটা করকায়া দিতে হবে।'

শামীম ভাই হাসেন, কেন, কম্প্লেইন কী?

আরে স্যার উনি ডিবি পরিচয় দিয়া নিরীহ নাগরিকদের হয়রানি করে।

শামীম ভাই আবারও হাসেন। আচ্ছা রেখে দেন রাতের জন্যে। আমি হাসানকে বলে দিচ্ছি। কাল সকালে ওকে ছেড়ে দিতে ও যেন বলে দেয়। আর শোনেন, মারধর করবেন না। প্লিজ হ্যাঁ...

***

বাবুকে হাজতে দেখতে এসেছে মাসুদ আর সারাহ। একসঙ্গে। সঙ্গে করে এনেছে এক গুচ্ছ ফুল। বাবু হাসে।

হাসান স্যারের লোক, স্যার আপনাকে জিপে করে পৌঁছে দিয়ে আসা হবে স্যার।

বাবু কলার নাড়ে। তারপর হেসে বলে, মাসুদ ভাই, মশার কামড়ে বড় কষ্ট পাইছি। কিন্তু কোনো কষ্টই আমার কাছে কষ্ট না। কারণ আপনেরে আর সারাহরে একসাথে দেখতে পেয়ে বড় ভালো লাগল। ওই ইন্টারভিউটা ছাপা হবে কি হবে না, এইটা আর আমারে ভাবতে হবে না। কী বলেন?

মাসুদ বলে, না ওই ইন্টারভিউ ছাপা হবে না।

বাবু বলে, তাইলে আবার ধরা খাইবেন। হা হা হা।

সারা বলে, মাসুদ ভাই, আপনাকে কি বাবু ভাই খালি ধরা খাওয়ায়? আহারে বেচারা। কত ভালো লেখে। আর আপনি বাবু ভাই তাকে সরল পেয়ে খালি ধরা খাওয়ান। একদম ঠিক করেন না। মাসুদ ভাই কত সুইট!

কণ্ঠস্বর

আমার নাম মুক্তি। ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বরে আমার জন্ম হয়েছিল, তাই এই নাম। আমার বয়স এখন ২৮ বছর ৩ মাস। বোঝাই যাচ্ছে, ২০০০ সাল এখন।

আমার মাকে আমার জন্মের পর থেকে দেখে আসছি, মা অন্ধ। মা অন্ধ ছিলেন না। আমার ভায়ের শোকে তিনি অন্ধ হয়ে যান। আমার বড় ভাই আমার চেয়ে ১৬ বছরের বড়।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে, ক্লাস টেনের ছাত্র ছিলেন তখন, বড় ভাই হাসান মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। আমার জন্মের আগের ঘটনা। আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু মা এতবার বলেছেন যে, আমি সব যেন চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি।

ভাইয়া এসে বলল, মা আমি যাচ্ছি।

মা বললেন, কই যাচ্ছিস।

ভাইয়া বলল, বাবারে বোলো না। বাবা শুনলে যেতে দিবে না। তুমি খালি দোয়া করো।

তোর কি যাওয়ার বয়স হয়েছে? হয় নাই তো। আরেকটু বড় হ। তারপর যাস।

মা আমি অনেক বড় হয়েছি। গেলে এখনই যেতে হবে। পাকিস্তানিরা আমাদের না হলে বড় হতে দিবে না মা।

বাবারে। তুই আমার একটা মাত্র ছেলে।

মা তুমিও তো আমার একটা মাত্র মা।

দেখো ছেলের কথা।

মা আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করো।

বাবা। বেঁচে থাক।

মা আমি আসলাম। বাবা আসার আগেই আমি কাটি।

ভাইয়া চলে গেল।

বাবা কিছুই জানেন না। রাতের বেলা বাবার পাশে শুয়ে মা কাঁদতে লাগলেন। বাবা বললেন, এই কী হইছে? কাঁদো কেন?

মা বললেন, হাসান তো আসল না।

কেঁদো না। দেখি সকাল হোক। এখন তো বাইরে কার্ফু। সকাল হলে খোঁজ করব।

কই খোঁজ করবা?

ওর বন্ধুবান্ধবদের কাছে। আর যদি মিলিটারি ধরে নিয়ে যায় তো...

না মিলিটারি ধরে নাই।

তাহলে?

ও যুদ্ধে গেছে।

বলো কী তুমি। যেতে দিলা?

আমার কথা শুনল নাকি।

না কাজটা তুমি ঠিক করো নাই।

এইসব কথা, প্রতিটি কথা, আমাকে কতবার শুনতে হয়েছে। একেকবার মনে হয়েছে, মা মনে হয় আমাকে ভালোইবাসেন না। তার অন্তর জুড়ে শুধু ভাইয়া আর ভাইয়া।

দেশ স্বাধীন হলো।

সব মুক্তিযোদ্ধা একে একে ফিরে এলো।

শুধু ভাইয়া এলেন না।

মা কাঁদেন আর কাঁদেন। কাঁদতে কাঁদতে তার দুচোখে ঘা হয়ে গেল। আর তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন।

তারপরেও তিনি কাঁদেন। তার কোলের পাশে সদ্যজাত আমি। আমার দিকে তার খেয়াল নাই। তিনি শুধু ভাইয়া ভাইয়া বলে কাঁদেন। অন্ধ হয়েছেন, এবার পাগল হবেন। আর আমাকে মারবেন।

আব্বা একটা কাজ করলেন। ভাইয়াকে খুঁজতে বের হলেন।

মা বসে আছেন। দিনের বেলা। বাবা আরেকটা ১৬ বছরের ছেলে আর একজন ২২ বছরের মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে এলেন।

হাসানের মা। এই যে তোমার হাসানরে নিয়ে আসলাম।

মা বললেন, হাসান। বাবা হাসান আইছস?

বাবা বললেন, হ্যাঁ। এই দেখো তোমার ছেলে। যুদ্ধে গিয়ে কী রকম শুকিয়ে গেছে।

আয় বাবা আয় বুকে আয় বলে মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন।

বাবা বললেন, এই যে কমান্ডার তৌহিদ। একসাথে ওরা যুদ্ধ করেছে।

কমান্ডার তৌহিদ বললেন, জি খালাম্মা। হাসান খুব ভালো যুদ্ধ করেছে।

মা বললেন, অতটুকুন ছেলে। ফিরে এসেছে। এতেই আমি খুশি। এতক্ষণ নকল হাসান কোনো কথা বলে নি।

মা বললেন, কিরে হাসান। কেমন আছিস?

প্রক্সি হাসান বলল, আছি মা।

দুপুরে ভাত খাইছিস?

জি খাইছি।

কী দিয়া?

এই তো ডাল ডিম এইসব দিয়া।

মা বললেন, বাবা। তুমি কার ছেলে? কাকে তোমাদের চাচা হাসান বানায়ে আনছে?

প্রক্সি হাসান বলল, কী বলো মা। আমি হাসান।

মা বললেন, বাবারে আমারে ফাঁকি দিতে পারবা না। আমি চোখে দেখি না। তাই বইলা নিজের ছেলেকে চিনব না।

স্যরি চাচি মা।

বলো কী হইছে আমার ছেলের। বলো। মা কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বললেন।

কমান্ডার তৌহিদ বললেন, চাচিআম্মা। ও তো আমার প্লাটুনেই ছিল। একটা যুদ্ধের সময় ওর পায়ে গুলি লাগে। ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমরা দ্রুত সামনের দিকে এগুই। গ্রামবাসীকে বলি হাসানকে যেন বাবুনগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে যুদ্ধের শেষে হাসপাতালে গিয়ে দেখি হাসান নাই। আমরা ওর কোনো খোঁজ পাচ্ছি না।

মা বললেন, ও শহিদ হয়েছে বলছ!

তৌহিদ বলল, না ও শহিদ হয় নাই। ও বেঁচে আছে।

মা চুপটি মেরে গেলেন। বললেন, আমি বুঝছি। আমি সব বুঝছি আমারে কিছুই আর বলতে হইব না। আমি সব বুঝছি।

আমি একটা স্কুলে চাকরি করি। ঢাকায় থাকি এখন আমরা। আমার মা আমার সঙ্গে থাকেন। বাবা মারা গেছেন, সেও অনেকদিন হলো।

স্কুল থেকে বাসায় ফিরছি। হাতিরপুল সেন্ট্রাল রোডে আমাদের বাসা। নিচতলায়, সিঁড়ির কাছে অন্ধকারে আমাদের বাসার প্রবেশদ্বার।

দরজায় নক করলাম।

মা বললেন, কে? মুক্তি?

খোলো।

আজকে এত দেরি করলি কেন?

রাস্তায় জ্যাম প্রচণ্ড। রিকশায় বসে ছিলাম আধঘণ্টা।

তোকে যে মোমবাতি আর কেক আনতে বলছিলাম আনছিস।

আনছি মা।

নে কেকটা বার কর। মোমবাতিটা জ্বালা। তারপর ফুঁদিয়ে নিবায়ে কেক কেটে খা।

আমি কেন কেক কাটতে যাব।

তাহলে কে কাটবে?

তোমার ছেলে যাকে আমি কোনোদিনও দেখি নাই তার জন্যে তোমার কত টান। আর আমার জন্মদিনটা যে আসে চলে যায় তুমি টেরও পাও না।

মনে থাকে না মা।

ছেলেরটা খুব মনে থাকে।

বাবারে। ১৬ বছরের ছেলে যুদ্ধে গেছে। মনে থাকবে না? ওকে আমি ভুলব কেমন করে মা?

সেই। অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

নে জ্বালা না মোমবাতিটা।

আমি মোমবাতি জ্বালাই।

মা বলেন, এবার ওই গানটা গা।

কোনটা?

হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।

আমি গাই, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থ ডে টু ...ডিয়ার হাসান ভাইয়া...

মা কাঁদতে শুরু করেন।

আমি বলি, মা কেঁদো না। এই জন্যে আমি কোনোবার নিজে নিজে মনে করতে চাই না ভাইয়ার জন্মদিনটার কথা। এইদিন তুমি খুব বেশি করে কাঁদো। খুব বেশি।

মা আর আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি।

মা বলেন, মুক্তি ঘুমালি?

না মা।

তোর কি মনে হয় তোর হাসান ভাইয়া বেঁচে আছে।

আমার কিছু মনে হয় না মা।

আমার মনে হয় বেঁচে আছে।

তাহলে ও যোগাযোগ করছে না কেন?

তোর বাবা বদলি হয়ে গেলেন। আমরা সবাই চলে গেলাম খুলনা। সেখানে দুই বছর। তারপর তো ...ও কার সাথে যোগাযোগ করবে? আমরা কোথায় ও তো জানেই না।

মা। তুমি আশায় আশায় আছ। আমি তোমার আশাটা নষ্ট করতে চাই না। তবে আমার ধারণা উনি বেঁচে নাই। শহিদ হয়েছেন।

কী জানি। বেঁচে থাকলে যে কোথায় আছে কেমন আছে। আর শহিদ হলে ওকে কোথায় কবর দিয়েছে?

মা তুমি আবার কাঁদবে?

না কাঁদব না।

মা বলেন বটে যে কাঁদবেন না, কিন্তু ঠিকই কাঁদেন।

সকালবেলা। আমি স্কুলে যাব। রেডি হচ্ছি। আজকে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। তাই খুব তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে। স্কুলটা এখান থেকে বেশ দূরে। রিকশার জ্যামে পড়ে গেলে লেট হয়ে যাব।

মা এখনও জায়নামাজে। তেলাওয়াত করছেন।

মুক্তি যাচ্ছিস? মার গলা।

এই তো মা।

নাশতা করছিস?

এখন আর খেতে ইচ্ছা করতেছে না। রুটিভাজি নিয়া যাচ্ছি। স্কুলে গিয়া খাব। তোমার নাশতাও টেবিলে থাকল মা।

খাইয়া যা। খালি পেটে গেলে অম্বল উঠবে।

আচ্ছা খাচ্ছি। বলে আমি পত্রিকার পাতা ওল্টাই। বিজয় দিবস সংখ্যা দিয়েছে। দ্রুত ওল্টাই। চা পিরিচে ঢেলে খেতে হবে। তাহলে তাড়াতাড়ি খাওয়া যাবে।

একটা লেখার শিরোনাম: হারিয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা। তাতে একটা ছবি ছাপা হয়েছে। ছবিটা দেখেই আমি চমকে উঠি। এ যে আমাদের দেয়ালে ভাইয়ার যে ছবিটা বড় করে বাঁধাই করে টাঙানো আছে, সে ছবিটা।

দ্রুত পড়তে থাকি। আমার ভাইয়েরই নাম তো। তারই বিবরণ লেখায়। পিরিচে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে হোক। আজ না হয় আর স্কুল গেলামই না। প্যারিস থেকে লেখাটা পাঠিয়েছেন পত্রিকার প্যারিস প্রতিনিধি।

ভাইয়া আছে। ভাইয়া বেঁচে আছে। ভাইয়া প্যারিসে আছে।

আমি মার কাছে ছুটে যাই, মা মা।

কী হলো রে।

মা। বিশাল খবর মা। পেপারে ভাইয়ার ছবি ছাপা হয়েছে।

কী বলিস। তুই চিনলি কী করে?

আমাদের দেয়ালে যে ছবিটা আছে সেটাই। হুবহু সেই চেহারা চিনব না।

কী বলিস। কী লিখছে?

আমি মাকে পড়ে শোনাই—

প্যারিস থেকে সংবাদদাতা: কিশোর মুক্তিযোদ্ধা হাসান জামান ওরফে হাসান আজ ২৩ বছর ধরে প্যারিসে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন তিনি নিতান্তই কিশোর। বাবুনগর সীমান্তের যুদ্ধের ময়দানে তিনি গুলিবিদ্ধ ও আহত হন। সেখান থেকে তাকে হেলিকপ্টারে করে অমরপুর হাসপাতালে আনা হয়। বহুদিন অচেতন ছিলেন তিনি। তারপর তার জ্ঞান ফেরে। ততদিনে দেশ স্বাধীন। তখন তাকে চিকিৎসার্থে প্যারিসে আনা হয়। মোটামুটি সুস্থ হলে তিনি দেশে তার বাবার ঠিকানায় চিঠি লেখেন। সেই চিঠির কোনো উত্তর আসে নাই। তার চিকিৎসাও ছিল দীর্ঘমেয়াদি। তিনি এখানকার স্কুলে ভর্তি হন। তারপর থেকে তিনি প্যারিসেই আছেন। এখন তিনি একজন পরিপূর্ণ যুবক।

আমি পড়ি। মা খুশিতে হাসেন। আর কাঁদেন।

স্কুলে না গিয়ে আমি যাই প্রথম আলো অফিসে।

রিসেপশনে পেপারটা দেখিয়ে বলি, এই যে মুক্তিযোদ্ধা, ইনি আমার ভাই। আমি ওনার খোঁজ চাই। কার সাথে দেখা করব?

রিসেপশন থেকে আমাকে একজনের কথা বলা হয়। উনি এসে আমাকে ডেকে নিয়ে তার ছোট্ট চেম্বারে টেবিলের বিপরীতে বসতে দেন। জি বলেন। উনি কথা পাড়েন।

আমি বলি, এই যে ছবিটা বের হয়েছে, ইনি আমার ভাই।

বলেন কী!

হ্যাঁ।

এতদিন উনি আপনাদের খোঁজ পাননি কেন?

আমি ভালো করে বলতে পারব না। আমার জন্ম একাত্তরের পরে।

তবু আপনার বাবা মার কাছ থেকে কিছু জানেন নাই।

বাবা বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন ঢাকার বাইরে।

আচ্ছা উনি যে আপনার ভাই কোনো প্রমাণ আছে।

আছে। আমাদের বাসায় ওনার একটা ছবি টাঙানো আছে। একই ছেলের ছবি। হুবহু বোঝা যায়।

আপনি ছবিটা আনতে পারবেন?

পারব।

নিয়ে আসেন না।

আচ্ছা আনছি।

আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়। আমিই আপনার বাসায় যাই।

চলেন।

ঠিকানাটা এখানে লেখেন।

আমি ওনাকে ঠিকানা লিখে দেই।

আপনি যান। আমার আজকে একটা জরুরি কাজ আছে। আমি কালপরশু আসছি।

আসবেন তো।

আরে কী বলে, এত বড় নিউজ। আসব না মানে।

আমি বাসায় ফিরে যাই। সেই সাংবাদিক আর আসে না।

মা অস্থির। কই মুক্তি। তোর সাংবাদিক তো আসে না।

আসবে তো বলল। ছাতার মাথা কি যে হলো।

মনে হয় আর আসবে না। তুই তোর ভাইয়ার ফোন নাম্বার এড্রেসটা নিয়ে নিতি।

তাও তো কথা। ওদের কাছে এড্রেস আছে কিনা তাও তো জানি না।

জিজ্ঞেস করেছিলি।

না জিজ্ঞেস করার সময়ই তো পেলাম না।

ছবিটা নিয়ে তুই যা। গিয়ে দেখা। তারপর তোর ভাইয়ার এড্রেসটা নিয়ে নে। তারপর চিঠি লেখ। না হলে ফোন কর।

তাই তো করব।

দেখ না আবার বাসার ঠিকানা ভুল করল কিনা একটু বাইরে গিয়ে দেখ।

বাইরে কই দেখব।

গলির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।

কী কথা। কখন উনি আসবেন না আসবেন আর আমি গলির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব!

তারপর তিনি আসেন। বাসায় ছবি দেখে নিশ্চিত হন আমরাই ওই মুক্তিযোদ্ধার স্বজন।

উনি বলেন, প্যারিসে ফোন করে উনি ভাইয়ার নাম্বার জোগাড় করে রাখবেন। তারপর আমাকে নাম্বার দেবেন। আমি তখন যোগাযোগ করতে পারব।

মার উত্তেজনা দেখে কে?

মুক্তি। আমার কী মনে হচ্ছে জানিস?

জি মা বলো।

তোর ভাইয়া এলে আমি চিনতে পারব না।

কেন মা?

এতদিন ফরাসী দেশে আছে। হয়তো মা ডাকতেও ভুলে যাবে।

যা কী যে বলো না তুমি মা। ছেলে কোনোদিন মা ডাকতে ভুলে যায়?

শোন। তোর হাসান ভাইয়া দেখতে না খুব সুন্দর ছিল। সুকান্ত কবি আছে না তার মতো।

মা আমি দেখতে কেমন। সেটা তো তুমি জানো না। বলো তো আমি দেখতে কেমন।

তুই? তুই দেখতে পরীর মতোন।

মা তুমি কোনোদিন পরী দেখেছ?

না দেখি নাই।

তাহলে যে বললা পরীর মতোন।

খুব সুন্দর বলার জন্যে বললাম।

মা আমাকেও তো তুমি কখনও দেখো নাই।

তাতে কী। তুই খুব সুন্দর।

মা। ভাইয়া ভাইয়া করেই তুমি জীবনটা কাটিয়ে দিলা। আমিও তো তোমার একটা মেয়ে। তাই না। আমাকে কিন্তু মা তুমি কোনোদিন একটু জড়ায়া ধরে আদরও করো নাই। বলো করেছ কোনোদিন?

হাসানকেও আমি কোনোদিন জড়িয়ে ধরে আদর করি নাই।

মা আজকে তুমি আমার মাথায় একটু হাত রাখবা?

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। আমি কাঁদি। আমার যে কত অভিমান আছে, কেউ জানবে না।

অবশেষে আমি ভাইয়ার ঠিকানা পাই। প্রথম আলো তাদের প্যারিস প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তিনি জোগাড় করে ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছেন ঠিকানা।

প্রথম আলোর সাংবাদিকই আমাকে বসিয়ে রেখে প্যারিসে ভাইয়ার কাছে ফোন করেন—হ্যালো আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি। শওকত ভাই আপনার ওপরে একটা লেখা লিখেছিলেন। আপনি হাসান বলছেন তো। নিন কথা বলেন।

উনি আমাকে ফোনটা এগিয়ে দেন।

আমি বলি, হ্যালো ভাইয়া। হ্যালো।

ভাইয়া। আমি মুক্তি। আপনার ছোটবোন।

আমার ছোট বোন মুক্তি?

হ্যাঁ। আপনি যুদ্ধে যাবার পরে আমি হয়েছি।

তাই নাকি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ভাইয়া। আমার বাবার নাম মনিরুজ্জামান। উনি ফুড ইন্সপেক্টর ছিলেন।

মা?

জি মা মাহফুজা খাতুন। এখন আর চোখে দেখে না।

ঠিক আছে। মার নাম তাই তো মনে পড়ে। অনেকদিন হলো বিদেশে। সব ঠিক মতো মনে নাই।

ভাইয়া মা আপনার জন্যে এখনও প্রতিদিন কাঁদে। ভাইয়া আমি চিঠি লিখে আপনাকে ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসেন। মা না হলে মরেই যাবে।

দেখি। আমার তো ছুটি নাই। ছুটি পেলে আসব একবার। এখন আমাকে একটু বেরুতে হবে। রাখি। বাসায় ফোন আছে?

নাই ভাইয়া।

আচ্ছা তাহলে পরে কথা হবে। আমাকে যেতেই হচ্ছে।

আচ্ছা।

আমার তথাকথিত ভাই ফোন রেখে দেয়।

আমি কী করব। আমি মুখভার করে ফিরে আসি বাসায়।

মাকে বলি, মা। ভাইয়ার সাথে কথা হয়েছে। ফোনে।

কী বলল রে?

তেমন কিছু না। আমাকে তো চেনে না। তাই বোধ হয় আমার সাথে ঠিকভাবে আলাপ করল না।

আমার কথা জিজ্ঞেস করল না।

বানিয়ে বলি, করেছে।

দেশে আসতে বললি?

বললাম।

কী বলল?

বললাম না আমাকে চেনে না। ভালো করে কথা বলে নাই। আমি মার ওপরে রাগ ঝাড়ি।

মা আবার চোখের পানি ফেলেন।

মা বলেন, মুক্তি, খাতা কলম নে। আমি বলি, তুই চিঠি লেখ।

আমি কাগজ কলম নিয়ে বসি। মা বলেন, স্নেহের হাসান। দোয়া নিও। পর সমাচার এই যে আমি তোমার হতভাগিনী মা। এর আগে তোমাকে আরো একটা চিঠি দিয়াছি। জানি না তুমি পাইয়াছ কিনা।

বাবা। যুদ্ধের সময় সেই যে চলিয়া গেলা, তারপর হইতে প্রতিটা মুহূর্ত...

মুহূর্ত বানানটা কঠিন। অন্য শব্দ বলো।

ম এ হ্রস্ব উ হ এ দীর্ঘ উ...

বাবা। তোমার বানান জ্ঞান তো টনটনা।

নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম না। ক্লাসে ফার্স্ট হতাম। নে কী লিখছি...

তোমার জন্যে প্রতিটা মুহূর্ত অপেক্ষা করিতেছি। তুমি তো বাবা আর আসিলা না। তোমার বাবা মারা গিয়াছেন। তাও বহুদিন হইল। এখন আমার যাবার পালা। শুধু তোমাকে আরেকটিবার কাছে পাইব তোমার

কণ্ঠে মা ডাক শুনিব, তারপর চলিয়া যাইব, শুধু এই জন্যে বাঁচিয়া আছি। তুমি বাবা একটিবার আসো।

মা কাঁদেন।

আমি কাঁদি না। আমার ভালো লাগে না।

মা বলেন, তোমাকে একটিবার ছুঁইয়া দেখিব। তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব।

এইবার আর না কেঁদে পারা যায়।

বাসায় ডাকপিয়ন আসে।

ভাইয়ার চিঠি আসে। অবশেষে।

আমি বাসায় ফিরতেই মা বলেন, মুক্তি। চিঠি এসেছে। দেখ তো কার চিঠি।

আমি দেখে বলি, মনে তো হচ্ছে ভাইয়ার।

চিঠি পড়ে শোনাই মাকে, মা। কতদিন পরে তোমাকে মা বলে ডাকতে পারলাম। তোমাদের খোঁজ কোথাও না পেয়ে আমি ভেবেছিলাম তোমরা মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে গেছ। তুমি বেঁচে আছ। কাজেই আমাকে দেশে ফিরতেই হবে। এখানে আমি চাকরি করছি। ১৪ তারিখ ছুটি। ইনশাল্লাহ ১৬ তারিখে এসে যাব। ঠিকানা তো আছেই। আমি ১৬ তারিখে ঠিক আসব মা। ইতি তোমারই হাসান।

মা আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরেন, হাসান আসছে। হাসান আসছে।

মা ব্যাপক প্রস্তুতি নেন ভাইয়ার আগমন উপলক্ষে। শোন। ও কী কী খেতে ভালোবাসে। ডালের বড়া। মাগুর মাছের ঝোল। ইলিশ ভাজা।

আমি বলি, সব তো রেডিই মা।

শোন। তুই এসে আমার সাথে শুবি। আর তোর বিছানাটা ওকে ছেড়ে দিবি।

আচ্ছা মা।

কিন্তু ভাইয়া আসেন না।

১৪ তারিখ পেরিয়ে যায়।

আমি ফ্লাইট এনকোয়ারিতে খোঁজ নেই।

শেষে এয়ার লাইন্সের অফিসে গিয়ে প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখি। নাম ছিল ওয়েটিং-এ। শেষে আসে নাই।

মা মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন।

প্রচণ্ড জ্বর আসে তার। তিনি কিছু মুখে তোলেন না। ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটে।

মার মুখে সারাক্ষণ হাসান হাসান শুনে ডাক্তার বলেন, হাসান কে?

আমি বলি, আমার ভাই। বহু বছর বিদেশে। ১৬ বছর বয়স থেকেই নাই। আজ থেকে ২৩ বছর আগে যুদ্ধে গেছেন। সেখান থেকে প্যারিস। গত পরশু আসার কথা ছিল। আসে নি। কোনো খবরও পাওয়া যাচ্ছে না।

ডাক্তার বলেন, ছেলের শোকে এই রকম করছেন। একটা কাজ করেন না। উনি তো চোখে দেখেন না। একজনকে ছেলে বানিয়ে ওনার সামনে আনলেই তো হয়। ১৬ বছরের ছেলেকে এনার মনে থাকার কথা নয়।

আমি বলি, ঠিক আছে। তাই করতে হবে।

আমি আমার স্কুলের নাটকের টিচার সাব্বিরকে হায়ার করে ভাইয়া হিসাবে নিয়ে আসি।

বেল বাজে।

আমি দৌড়ে দরজা খুলি। সাব্বির সুটকেস হাতে আসে, আমি বলি, মা ভাইয়া এসেছে। মা ভাইয়া, ভাইয়া কেমন আছ।

মা ছুটে আসেন। হাতড়ে হাতড়ে বলেন, কই আমার হাসান। বাবা কাছে আসো।

নকল হাসান মার কাছে যায়। মা তার চোখমুখে হাত দিয়ে আদর করেন।

মা বলেন, বাবা কেমন আছিস।

সাব্বির বলে, আছি মা। তুমি কেমন?

আছি। দেরি হলো কেন?

আর বোলো না। মা। ফ্লাইট লেট।

এই তুমি কে? তুমি তো আমার হাসান না।

কন বলছ এই কথা।

হাসানের গলা আমি চিনব না।

তখন আমার বয়স ১৬ ছিল।। তাছাড়া কতদিন ফ্রান্সে আছি। গলা বদলাবে না?

নানা। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা তুই ওই ছড়াটা বল তো। যেটা তুই আর আমি দুজনে মিলে বানিয়েছিলাম। ঝিকির ঝিকির ...

মনে নাই মা।

মুক্তি। তোর বাবাও এই রকম করছিল। আরেকজনকে হাসান বানায়ে আনছিল। আমাকে ভোলানো সহজ নয়। যাও বাবা কার ছেলে। বেঁচে থাকো বাবা।

সাব্বির বলে, স্যরি আন্টি। মাফ করে দিয়েন।

আমি জানি না মা কীভাবে ধরতে পারল।

আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি বাসায় অপরিচিত লোক। মা তাকে ভাত খাওয়াচ্ছেন। ভালো করে তাকিয়ে বুঝলাম, ভাইয়া এসেছেন।

আশ্চর্য তো। মা চিনল কেমন করে।

মা বলেন, বাবারে। আমাকে ওরা ঠকাতে চায়। কিন্তু আমি জানি সব বদলে যায়। ছেলের মুখের মা ডাক বদলায় না। সব বদলানো যায়। মা ডাকটা বদলানো যায় না। ওরা আমাকে কত বোঝাল। এখন তো আর মা বলবে না।

আমি দূরে দূরেই আছি। মা তার ছেলেকে নিয়ে আহ্লাদি করছেন। ছেলেকে ভাত তুলে খাওয়াচ্ছেন আর ছড়া বলছেন—

ঝিকির ঝিকির রেলগাড়ি
যাবে তুমি কার বাড়ি
যাব আমি চট্টগ্রাম
সেইখানে নানার গ্রাম

মা আর ছেলের এইসবের মধ্যে আমি কে?

পিতা

জহুরুল ইসলাম তালুকদার দীর্ঘদিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। নিজের জমিজমা ছিল, তালুকদার মানুষ, থাকবারই কথা। স্কুলটাও ছিল বাড়ির পাশে। নিজের জমির চাল, নিজের গরুর দুধ, নিজের বাগানের ফল, তিনি ভালোই ছিলেন। তার দুটি মাত্র ছেলে, তারা লেখাপড়া করেছে, ঢাকায় করে কিনে খাচ্ছে। এবং ভালো আছে। জহুরুল ইসলাম গ্রামে থাকেন। তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে বছর চারেক আগে, স্ত্রীর কবরটাও বাড়ির উত্তরে, বাঁশঝাড়ের নিচে। একটা ডালিম গাছও লাগিয়েছেন তিনি, নাতি-নাতনিরা এলে তিনি তাদের আবৃত্তি করে শোনাতে পারবেন, এইখানে তোর দাদির কবর, ডালিম গাছের নিচে।

কিন্তু নাতি-নাতনিরা আসে কই।

পুরা বাড়ি খাঁ খাঁ করে।

আহা, কী গমগমই না করত বাড়িটা। ছেলেগুলো নিজের প্রাইমারি স্কুলে পড়েছে, বৃত্তি পেয়েছে, তারপর গেছে থানা সদরের হাইস্কুলে, নিজেরা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেত।

তারপর বড় হলো। ইউনির্ভার্সিটিতে পড়ার জন্যে ঢাকা গেল। আর ফিরল না। ওখানেই বিয়েশাদি করে শেকড় গেড়ে ফেলেছে।

তাদের সবার ছবি তিনি তুলে লেমিনেটেড করে বাঁধাই করে রেখেছেন।

সর্বশেষ সবাই এসেছিল ওদের মা যেদিন মারা গেল, সেদিন। একদিন থেকে ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনিরা সবাই ঢাকায় ফিরে গেল কুলখানি করে। ওই সময়েই ওদের একটা ক্যামেরায় ছবি তোলা

হয়েছিল পুরো পরিবারের। সেইটার কপি তিনি সব সময় পকেটে রাখেন।

সব সময়।

বড় টিনে ছাওয়া বাড়ি তার। দেয়াল ইটের। বড় টানা বারান্দা। জহুরুল ইসলাম তালুকদার বারান্দায় বসে কাঁসার বদনায় পানি নিয়ে ওজু করছেন। ওজুর পানি দিয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রী আসমা। তারই জামাই রহমত। ওরা এই বাড়িতে থাকে। তালুকদার সাহেবকে দেখে। আর রহমত আশায় আশায় আছে তার সম্পত্তি পাবার।

সামনে মোরগ-মুরগি ছাগল কবুতর চড়ছে।

বাক বাকুম শব্দে আঙিনাটা সরগরম। একটা মুরগি কট কট কটাস বলে ডেকে উঠল। মনে হয়, ডিম পাড়ল এখনই। মুরগি ডিম পাড়লে নিজেই ডাকে, আর মানুষ বাচ্চা দিলে বাচ্চা কাঁদে আর ছেলের বাবা আজান দেয়।

আসমা। তালুকদার ডাকেন।

আসমা কাছেই ছিল, জবাব দিল, জি চাচা।

রহমত কই?

মনে হয় কেলাবে গেছে।

ক্লাবে কী করে সারাদিন?

কী জানি, ক্যারম খেলে।

কাম কাজ কিছু করব না হে?

আপনে তো ভালো কইরা কিছু কন না। শক্ত কইরা বকা দেন। ঠিকই করব।

অরে খবর পাঠা। আইজকা তালগাছে লোক উঠামু। ভাদ্রমাস যায়। তাল পাড়তে হইব না?

অহনই খবর পাঠামু?

হ। জহুরুল ইসলাম তালুকদার কুলকুচা করেন।

আসমা তার ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। ৭ বছরের বাবলু খালি টই টই করে ঘুরে বেড়ায়। নানার নাম ডোবাবে মনে হচ্ছে। বাপের নাম রাখবে। পড়াশোনায় মতি কম। সেও ক্লাবে যায় টিভিতে বাংলা সিনেমা দেখতে। বড় হলে শাবনুরকে বিয়ে করবে, সেদিন সে মাকে বলেছে কাউকে না বলার শর্তে।

বাবলু বাবলু।

বাবলু একটা বাতাবি লেবু গাছে উঠে বসে আছে।

মাথায় বাতাবি লেবুর ছাল দিয়ে বানানো টুপি। গাছ তার বড় প্রিয় জায়গা। তার মাঝে-মধ্যে মনে হয়, মানুষ কেন মাটিতে ঘরদোর বানায়। গাছের ওপরে কেন ঘর বানায় না। কী শান্তি এই গাছের ডালে শুয়ে থেকে বাতাসের তালে তালে দোল খাওয়া।

বাবলু বাবলু।

বাবলু লাফিয়ে নামে–মা। কিছু কইবা?

আসমা বলে, বাবারে ডাইকা আন তো। বাবা মনে হয় কেলাবঘরে কেরাম খেলে। যাও গিয়া কও নানায় ডাকে। জরুরি।

বাবলু আচ্ছা বলে একটা কঞ্চিকে গাড়ি ভেবে ঠেলতে ঠেলতে মুখে স্টার্টের শব্দ করতে করতে ক্লাবে যায়।

ক্লাবঘরে তার বাবা রহমত আর সকলের সাথে কেরম খেলছে। সে কোনো কাজ পারে না বলে যে অপবাদ চারদিকে প্রচলিত, সেটা ঠিক নয়। সে খুবই ভালো কেরম খেলতে পারে।

বাবলু ডাকে, বাবা বাবা।

রহমত কেরমের গুটি মেরে একটা সাদা ফেলে রেডটা টার্গেট করে বলে, ওই হারামজাদা। রেড মারার সময় ডিস্টার্ব করবি না। সর এখন।

বাবলু বোর্ডের ওপরে উঁকি দিয়ে খেলার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করতে করতে বলে, নানায় ডাকে।

রাখ তোর নানা কানা। আমি রেড মারি।

আচ্ছা আমি গিয়া কইতেছি নানারে তুমি কানা কইছ।

ক গা।

বাবলু দৌড় ধরে। তার কঞ্চির গাড়ি। ভটভটভট। হেভি স্পিড। মুহূর্তে সে মাস্টার সাবের তালুকদার বাড়ির অনেকটা কাছে চলে যায়।

রহমত রেড মারে।

মিস হয়।

পাশের খেলোয়াড় বাঁইটা জসিম বলে, বাবলু কিন্তু তোমার চাচাশ্বশুররে কইতে গেল তুমি তারে কানা কইছ। তাইলে তুমি আর তার সম্পত্তি জীবনেও পাইবা না।

রহমতের হুঁশ হয়। কয় কী। এ আমি আর খেলুম না। চাচা ডাকে। আমি যাই।

বাবলুর পেছন পেছন রহমতও দৌড়ে আসে। রাস্তায় বাবলুকে ধরে গুটলি পাকিয়ে ফেলে দিয়ে আগে আগে দৌড়ায়।

তারপর আসে তালুকদার মাস্টারের কাছে। মানে তার চাচার কাছে।

তালুকদার মাস্টার তখন শীতকালীন আমের একটা সদ্য লাগানো চারা গাছের পরিচর্যা করছেন। শরতকাল। বর্ষায় চারাটা লাগিয়েছিলেন। এতদিন বর্ষার জলে গাছটা বেশ তরতরিয়ে বাড়ছিল। এখন এটার যত্ন দরকার হবে। বিশেষ করে চারপাশের আগাছাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা চাই।

এই সময় রহমত আসে—চাচাজান। ডাকছেন।

হ। চলো। আইজকা বিকালে তালগাছে লোক উঠাই। ভাদ্রমাস চইলা যাইতাছে না?

হ। যাইতেছে তো।

আউশ ধানের আটা কুটতে কই। পিঠা খাইতে হইব না।

হইব তো চাচাজান।

তাইলে বিকালে। ঠিক আছে।

জি চাচাজান।

বিকালবেলায় তালপাড়ার উৎসব শুরু হয়। পাশের গ্রাম থেকে সিরাজগাছি আসে। তার কোমরে বড় দড়ি, হাতে কাটারি। সে তড়তড়িয়ে উঠে পড়ে তালগাছে। শালা, আস্ত একটা বান্দর। রহমত বলে। বাবলু তার পোকায় খাওয়া দাঁত বের করে সেই কথা শুনে হাসে।

নিচে চাদর ধরে তার ওপরে তাল ফেলা হচ্ছে।

সেই তাল কুড়িয়ে এনে বাবলু জমা করছে।

তালুকদার মাস্টার আর রহমত তদারকি করছে। রহমতের হুংকারটা বেশি। হাজার হলেও, মাস্টার আর কয়দিন। তারপর তো তারই হয়ে যাবে পুরো তালুক।

আসমাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঢেঁকিতে চাল কুড়ে আটা বানানোর কাজে। ঢেকিতলা একটা আছে বটে এই বাড়িতে, কিন্তু তাতে সারা বছর বিড়াল ঘুমিয়ে থাকে আর বাচ্চা দেয়। কারণ ধান এখন হাটের কলেই ভাঙানো

হয়। খোদ তাদের এই বাড়িতে বিদ্যুৎ চলে এসেছে। পল্লী বিদ্যুৎ। সন্ধ্যার সময় থাকে না। রাত ১১টা ১২টায় আসে। তবু তো আসে।

ও ধান ভানো রে ঢেঁকিতে পার দিয়া, তুমিও নাচো আমিও নাচি হেলিয়া দুলিয়া। তালুকদার মাস্টারের মনে গান। এই দৃশ্যটা তার এত ভালো লাগে। নরম চাল কুটে ধবধবে সাদা আটা বের হচ্ছে। এই আটার প্রথম পিঠাটা যা মজা।

আহা। তার স্ত্রী আমেনা যদি আজ বেঁচে থাকতেন। তিনি নিজহাতে সবকিছু করতেন।

আর তার ছেলেরা। নাতি-নাতনিগুলো। বছরকার একটা ফল তাল। বছরকার একটা খাদ্য-পিঠা। ওরা খাবে না।

না না, ওদেরকে আসতে হবে।

দুপুরবেলা তিনি চিঠি লিখতে বসেন।

আসমা হামানদিস্তায় পান পিষছে।

মাস্টার হাক পাড়েন, এই পান দে। পান না খাইলে আমার লেখা আসে না।

আসমা বলে, চাচাজান, আপনে কী লেখেন।

ছেলে দুইটারে চিঠি লিখি। তালের পিঠা খাইব না হেরা। নাতিনাতনিগুলান খাইব না? তাই লেইখা দেই। আসুক।

তিনি কলম তুলে ভাবেন, আবার লেখেন। আসমা পান পেষে।

মাস্টার বলেন, এই শব্দ করিস ক্যান? থাম।

আপনে না কইলেন পান খাইবেন।

হ হ। শব্দ না কইরা তাড়াতাড়ি পিষ। পান না খাইলে আমার লেখা আসে না।

চিঠি লেখা শেষ করে তালুকদার মাস্টার নিজে যান গ্রামের পোস্ট অফিসে। চিঠি পোস্ট করতে। সাথে নাতি বাবলু।

পোস্টমাস্টার বলে, মিয়া সাহেব। কাকে চিঠি লিখলেন?

তালুকদার খামে ঠিকানা লিখতে লিখতে বলেন, আমার দুই ছেলেকে।

ঢাকায় থাকে?

জি। ঢাকায় থাকে। এই যে ছবি।

তিনি ল্যামিনেটেড গ্রুপ ছবিটা বের করেন। তাতে তিনি, তার দুই

ছেলে, দুই ছেলের ঘরে চারটা নাতি নাতনি, ছেলের বউ। তিনি পরিচিতি বলেন, এইটা আমার বড়ছেলে রুহান, এইটা ছোট ছেলে, রজব, বড়বউমা, ছোটবউমা, বড় ঘরের দুই নাতি, ছোট ঘরের এক নাতনি। সবাইরে দাওয়াত করলাম। তালপিঠা খাইতে আইব। বিষ্যুদবারে আইব। শুক্রবারটা থাকব। শনিবারে যাইব সবাই।

পোস্টমাস্টার বাবলুকে দেখিয়ে বলে, তাইলে আপনের সাথে এইটা কেডা?

বাবলু। আমার নাতি।

এইটা কোন ঘরের?

এইটা আমার ভাস্তি আছে আসমা অর ছেলে। এইটাই এখন আমার লাঠি হইছে।

আপনে ঢাকায় গিয়া থাকলেই পারেন। সবাই যদি ঢাকায়...

ঢাকায় আমার দম আটকায়া আসে। ঢাকায় আমি যামু না। আর তা ছাড়া অগো মায়ের কবরটা আছে। আমি না থাকলে মহিলা একলা গেরামে পইড়া থাকব কেমনে!

অ। তাও তো কথা।

কাজ সেরে তালুকদার মাস্টার বলেন, চলরে বাবলু।

বাবলু বলে, চলো। আমারে কিন্তু নানা দোকান থাইকা লজেন্স কিনা দেওন লাগব।

আচ্ছা চল তো। লজেন্স খাইয়া খাইয়া তো দাঁতে পোকা বানাইছস। চল।

মাস্টার আর বাবলু ফিরে আসে গাঁয়ের পথে। তাদের গন্তব্যের দিকে তাকিয়ে পোস্টমাস্টার বলে তার পিয়নকে, দেখছ বুড়ার প্রেম। সম্রাট শাহজান। মমতাজ মহলের লাইগা পইড়া আছে গ্রামে।

রাতের বেলা। ঝিঁঝি ডাকছে। দূরে কাশবন থেকে শেয়ালের ডাকও আসে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শোনা যায় কুকুরের ডাক। তালুকদার ভাত খাচ্ছেন। এইমাত্র বিদ্যুৎ এসেছে। ৬০ পাওয়ারের বাতিও টিম টিম করে জ্বলছে, কারণ ভোল্টেজ কম। পাশে নাতি বাবলু। সেও খাচ্ছে ফুলবাবুটি হয়ে বসে। ঘুমে তার দুই চোখ জড়িয়ে আসছে।

আসমা তুলে দিচ্ছে ভাত।

তালুকদার মাস্টার বলেন, রহমত ফিরে নাই অহনও।

আসমা বলে, না চাচাজান।

এত রাইতে কই কী করে?

কেলাবে টেলিভিশন দেখে।

বাবলু বলে, ভাত খাইয়া মা আমিও যামু। আইজকা একখান সিনেমা দেখাইব কইলাম।

আসমা বলে, না। কাইলকা সকালে স্কুল আছে না।

বাবলু বলে, সকালে স্কুল আছে যামু।

তালুকদার বলেন, আসমা রে। রুহান রজব তো আইল না। কাইলকা না সকালে পিঠা বানাইবা?

আসমা বলে, হ। বানামু তো।

তালুকদার বলেন, আইজকা না বিষ্যুদবার গেল।

আসমা সায় দেয়, হ।

তালুকদার বলেন, চিঠি পায় নাই নাকি।

আসমা বলে, কেমনে কই।

জহুরুল ইসলাম তালুকদার মাস্টারের মনটা খারাপ হয়ে যায়।

তিনি আর খেতে পারছেন না। উঠে যান।

আসমা বলে, কী হইল। উঠলেন ক্যান।

তালুকদার বলেন, রুহান রজব আইব না?

পরের দিন সকাল।

জহুরুল ইসলাম তালুকদার বাইরের বারান্দায় বসে আছেন ছেলেদের পথের দিকে চেয়ে।

বাবলু আসে।

বাবলু বলে, নানাভাই। আইজকা না তালপিঠা বানানোর কথা। মা তো বানাইতেছে না।

ক্যান বানাইতেছে না ক্যান।

মা কইল, তোমার মন খারাপ। মামারা ঢাকা থাইকা আসে নাই তো। সেই জন্যে। মা কইছে পিঠা বানানো হইব না। নানাভাই তুমি মারে কও বানাইতে। আমি পিঠা খামু।

যা তর মারে ক, পিঠা বানাক।

মা মা নানা কইছে বানাইতে, মা মা নানা কইছে পিঠা বানাইতে...বলতে বলতে বাবলু তার কঞ্চির গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দৌড় ধরে।

আসমা তালপিঠা বানাচ্ছে। পিঠা বানানো সহজ নয়। পিঠা কিছুতেই সাইজে থাকতে চায় না। ভেঙে ছাড়া ছাড়া হয়ে যায়। তার চাচি আম্মা পারত পিঠা বানাতে।

একটা পিঠা নামে। বাবলু পাশে বসে বলে, খামু।

আরে গরম তো। গরম তেলে মুখ পুড়ব। একটু পরে খা। ফু দে ফু দে।

বাবলু ফু দিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে পিঠা খায়।

আসমা পিঠা এনে তালুকদারের সামনে রাখে।

পাশে বসে আছে রহমত।

আসমা বলে, চাচাজান। নেন। পিঠা খান। রহমতকে বলে, তুমিও লও...

তালুকদার বলে, থুয়া যা।

আসমা রেখে চলে যায়।

তালুকদার বলেন, রহমত ন্যাও। পিঠা খাও।

রহমত বলে, আপনে আগে নেন চাচাজান।

না আমার শরীলটা ভালা না। আমি আজকা আর খামু না।

চাচাজান। ভাইজানরা ঢাকা শহরে ব্যস্ত মানুষ। ওনারা কি পিঠা খাইতে গেরামে আসতে পারে?

আপনি মাইন্ড খাইয়েন না। হুনেন। এরা আর গেরামে আসব না। বিষয় সম্পত্তিগুলান ভূতে খাইব। আপনে এক কাজ করেন। আমারে কিছু দিয়া থুয়া যান। যে কয় কানি দিবেন সেই কয়কানিই রক্ষা পাইব। আমি আপনের কবরে, চাচির কবরে বাতি দিমু। বাবলু দিব।

নেও পিঠা খাও। তুমি কইতে চাও হেরা আইব না?

ক্যামনে আইব। পিঠা খায় আর মুখে বলে,শহরে হে গো কাম আছে না?

আমি কই বলে আইব।

তালুকদার বাবলুকে নিয়ে পোস্ট অফিসে যান আবার।

পোস্ট মাস্টারকে বলেন, একটা টেলিগ্রাম লেখেন। দুই ঠিকানায় পাঠান।

পোস্টমাস্টার কাগজকলম নিয়ে তৈরি।

তালুকদার বলেন, আংকেল সিরিয়াসলি ইল। ওয়ান্ট টু সি ইউ বিফোর ডেথ। কাম শার্প ফুল ফ্যামিলি। আসমা।

আংকেল কে? কার অসুখ?

আমার।

আপনেরে তো সুস্থই লাগে।

মনের অসুখ। বুঝবেন না। কত টাকা লাগব এই টেলিগ্রাম পাঠাইতে সেইটা বলেন।

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তালুকদার কৌশল ঠিক করেন।

বাবলুকে বলেন, শুন। তুই পাহারা বসা। যেই দেখবি তোর মামারা আইতেছে আমারে খবর দিবি। আমি শুইয়া পড়ুম। আমার অসুখ হইব। পারবি না?

বাবলু বলে, খুব পারুম।

তালুকদার বাড়ির ভেতরে বাঁশের কাজ করছিলেন একটা। বাইরে গাছের ওপরে বসে আছে বাবলু। তার প্রিয় স্থানে। আহা, চিরকাল যদি গাছের ওপরেই থাকা যেত। নানাকে সে বলবে, গাছে তাকে একটা বিছানা বানিয়ে দিতে।

একটা মাইক্রোবাস দেখা যায় আসছে। বাবলু সচকিত।

আমগো বাড়ির দিকেই তো আহে।

বাবলু তড়াক করে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে যায় বাড়ির ভিতরে। নানা। নানা। একটা গাড়ি আসতেছে আমগো বাড়ির দিকেই।

তালুকদার তটস্থ। তাই নাকি। আসমা আইয়া পড়ছে। তুমি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি হুইয়া পড়ি। আমার ম্যালেরিয়া হইছে বুঝছ। ডাক্তার আমারে কুইনাইন খাইতে দিছে।

তিনি দৌড়ে ঘরে যান। মাথার কাছে কিছু প্যারাসিটামল কিছু সিরাপ সাজিয়ে রেখে দেন।

একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন।

তারপর জ্বরের ভাণ করে আহ উহ করতে থাকেন।

মাইক্রোবাস এসে থামে।

তালুকদারের বড় ছেলে রুহান, তার বউ মিমি, তার দুই বালুকপুত্র প্রিন্স ও রাজা, ছোট ছেলে রজব, তার বউ আনা, তার মেয়ে পুষ্প নামে মাইক্রোবাস থেকে।

আসমা এগিয়ে যায়, আসেন ভাইজান। আসেন ভাবি। বাবারা কেমন আছো। মা তুমি কেমন আছ।

রুহান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, বাবার কী অবস্থা।

আসমা বলে, আছে। বাঁইচা আছে। আসছেন। নিজ চক্ষে দেখেন।

ওরা সবাই দলবেঁধে তালুকদারকে দেখতে যায়।

তালুকদার শুয়ে আছে। ঢাকার পার্টি তার পাশে।

রুহান তার বাবার হাত ধরে।

রুহান ডাকে, বাবা।

কে? রহমত? বাবা না চেনার ভাণ করেন।

বাবা আমি রুহান। আপনার বড়ছেলে।

রুহান। আইছ। কেমন আছ বাবা।

আমি ভালো আছি বাবা। আপনার কী হয়েছে?

বয়স বাবা। বয়স। মরতে তো হইবই একদিন। তাই না?

না বাবা। আপনার কী এমন বয়স। আপনার কিছু হবে না। আপনি ঠিক হয়ে যাবেন।

বউমারে আনো নাই।

এসেছে তো। মিমি...

জি বাবা আমি আসছি।

ভালো আছো মা?

মিমি বলে, আছি। এই যে আপনার দুই নাতি... প্রিন্স আর রাজা...

তালুকদার আবার অভিনয় করে আহ উহ করেন।

তারপর রজব এগিয়ে যায়।

রজব বলে, বাবা আমাকে চিনতেছেন?

কে?

আমি রজব।

রজবও আসছ।

জি বাবা।

ভালো আছ বাবা। বউমা ভালো আছে।

এই তো আপনার বউমাও এসেছে। আনা। এদিকে আসো।

আনা বাবার হাত ধরে। বলে, আপনার নাতনিও এসেছে। পুষ্প, আসো....

তালুকদার বলেন, ভালো থাকো মা ভালো থাকো বোন...

আসমা আসমা। পোলাও চড়া। বড় মোরগ দুইটা ধর। আমার নাতি নাতনিরা আইছে। রহমত কই? অরে কও পুকুরে জাল ফেলুক।

আনা বলে, নানা। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা কি খেতে এসেছি নাকি। আপনাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছি।

তালুকদার বলেন, তোমরা আসছ। আমার শরীল ভালো লাগতেছে। এই তো আমি শরীলে বল পাইতাছি। উঠে বসার ভাণ করে তালুকদার আবার পড়ে যান। আবার উঠে বসেন।

পুকুরে জাল ফেলা হচ্ছে।

রহমত ছুটে আসে শয্যাশায়ী বাবার পাশে।

রহমত কাঁদতে কাঁদতে বলে, চাচাজান। আপনের শরীলটা এত খারাপ আমি তো জানি না। সারা দুনিয়ার মানষে জানে। আর আমি আপনার ভাস্তি জামাই হইয়া জানলাম না।

তালুকদার বলেন, জানবা ক্যামনে? যাও কেলাবে গিয়া কেরাম খেলো যাও।

আপনের নাকি যখন তখন অবস্থা। যে কোনো সময় জান চইলা যাইতে পারে।

হ। পারেই তো।

তাইলে আমি মুহুরি ডাকি। রেজিস্ট্রি অফিসের লোক ডাকি। আপনে আমারে দশ কানি জমি অন্তত লেইখা দেন। নাইলে আইজকাই আপনি চোখ বন্ধ করলে ভাইজানরা আমারে কুকুর বিলাইয়ের মতো কইরা তাড়ায়া দিব। দুর ছাই করব।

দিমু। যখন সত্য সত্য চোখ মোজার সময় হইব। তখন দিমু। অহন যাও। দেখো তোমার ভাইভাবি ভাগনা ভাগনির অযত্ন না হয়।

ঢাকার সবাই মিলে পোলাও কোর্মা খাচ্ছে। আসমা পরিবেশন করছে। দূরে একটা নেড়ি কুত্তা লেজ নাড়ছে। তাকে দেখে পাশের বাড়ির বিড়ালটা বারান্দা থেকে উঠে জানালার কার্নিশে বসে।

মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে খাচ্ছে সবাই। বাবলুও খাচ্ছে।

তালুকদার আস্তে আস্তে উঠে এখানে আসেন।

বাবা আপনি উঠে এলেন কেন কষ্ট করে। যান শুয়ে থাকেন।

নানা তো উঠতে পারে। নানার কিছু হয় নাই। আমারে নানা কইছে যখন আপনাগো গাড়ি আসব তখন তারে দৌড়ায়া কইতে। আমি গাছে উইঠা ছিলাম। যেই গাড়ি আইছে আমি কইছি। নানা দৌড়ায়া গিয়া বিছনাত শুয়া পড়ছে। বাবলু গোমর ফাঁক করে দেয়।

বাবলু তোর মিছা কথা কওনের অভ্যাসটা গেল না...এত বানায়া কথা কইতে পারে ছেলেটা...

আমি মিছা কইতেছি না। তুমি কইতেছ...

তালুকদার বলেন, আমার শরীলটা খারাপ লাগতেছে। আমি যাই গা... তিনি চলে যান বিছানার ঘরের দিকে।

কিন্তু ঢাকার পার্টি ঠিকই বুঝে ফেলে বাবার চালাকি।

মিমি বলে, বাবা। আপনার ছেলেদের দেখতে ইচ্ছা করছে এই কথাটা বললেই তো হতো। কেন মিথ্যা কথা বলতে গেলেন। ও তো আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। ওর না হাই ব্লাড প্রেসার। প্রেসার বেড়ে হি হয়ে গিয়েছিল।

আনা বলে, আর রজবের তো আজকে সাংঘাতিক একটা মিটিং আছে। চাইনিজ পার্টির সাথে এগ্রিমেন্ট সাইন। কত টাকা যে ওর লস হয়ে গেল। আপনি বাবা কেন যে ছেলেমানুষি করেন।

রুহান বলে, বাবা। আমরা আর দেরি করি না। চলে যাচ্ছি।

রজব বলে, হ্যাঁ। এখন রওনা দিলে অন্তত কাল সকালে অফিস ঠিকভাবে করতে পারব।

তালুকদার বলেন, এখনই যাইও না। বিকালে আসমা পিঠা বানাইব। খাইয়া তারপরে যাবা।

রজব বলে, না বাবা। পিঠা খাওয়ার সময় আছে নাকি।

আসমা পিঠা বানাচ্ছে। কিন্তু তালুকদারের ছেলেমেয়ে নাতি নাতনির সময় নাই।

ওরা সবাই মাইক্রোতে উঠছে।

বাবলু দৌড়ে গিয়ে নানাকে খবর দেয়। নানা, মামারা চইলা যাইতেছে।

তালুকদার উঠে আসেন। মাইক্রোবাসের কাছে যান। বলেন, এখনই যাইবা। একটু পরে যাও। তোমাগো দেখতে ইচ্ছা করে। তাই এইভাবে আনছি। নাইলে তো তোমরা আসো না। আরেকটু থাকো। ৫ মিনিট।

রজব বলে, না বাবা ঢাকায় অনেক কাজ।

তালুকদার বলেন, আসমা পিঠা বানায়। হইয়া গেছে। একটু বসো। দিয়া দিক। লইয়া যাও।

ওরা গাড়িতে ওঠে। গাড়ি চলে যায়।

তালুকদারের চোখের কোণে জল। অপরাহ্নের হেলে পড়া সূর্যের আলোয় সেই জল চিকচিক করে।

আসমা দৌড়ে আসে। গামলায় গরম পিঠা। চাচা অরা গেল গা? পিঠা হইয়া গেছে।

তালুকদার ধরে আসা গলায় বলেন, অগো দেওনের দরকার নাই। বাবলুরে দেও। রহমতরে খবর দেও। মুহুরি ডাকুক। রেজিস্ট্রি অফিসের লোক ডাকুক। আজকাই আমি জমি ....

গাড়ি ফিরে আসে।

তালুকদারের চোখে আনন্দ ঝিলিক দেয়—ওই যে অরা ফিরা আইতেছে।

গাড়ি থামে।

ওরা নামে।

রজব বলে, বাবা। ফিরে এলাম। সন্ধ্যার পরে রওনা দিব।

তালুকদার গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন।

রুহান বলে, বাবা আমাকেও একটু জড়িয়ে ধরেন।

তালুকদার তাকেও জড়িয়ে ধরেন।

তারপর ওরা ফিরে যায় ঢাকায়। আবার নিঃসঙ্গ দিন আসে বৃদ্ধ এই পিতার জীবনে। কীভাবে যায় একেকটা দিন।

সময় কাটতে চায় না।

ছেলেপুলেদের দেখতে ইচ্ছা করলে সেই অ্যালবামই ভরসা।

পুকুর ধারে হাঁটছেন তালুকদার আর রহমত। ছয়মাস পরের কথা।

রহমত। কইগুলান বড় হইছে না। তালুকদার বলেন।

থাই কই। বড় তো হইবই। একেকটা তেলাপিয়া মাছের চাইতেও বড় হইছে। এই সাইজ। রহমত বলে।

কবে জাল ফেলবা।

আপনে কন?

শুক্রবারে ফেলি।

ফেলেন।

ঢাকাত খবর দেই। ছেলেপুলেরা আসুক। পুকুর থাইকা মাছ তোলা তো অরা কখনও দেখে নাই। কী খায় না খায়। সব ফরমালিন দেওয়া মাছ। মাছ খায় না বিষ খায়।

দেন খবর। কিন্তু অরা কি আর আইব। ঢাকার পোলাপান। ফরেন জিনিস ছাড়া খায়ও না। ফরেন জিনিস ছাড়া আগ্রহও নাই।

দেখি আসে নাকি না।

তালুকদার চিঠি লিখছেন।

আসমা পান পিষছে।

তালুকদার বলেন, পান পিষ। ভালো কইরা পান পিষ। পান না খাইলে আমার লেখা আসে না।

তিনি লেখেন:

স্নেহের বাবা রুহান,

দোয়া রইল। আগামী শুক্রবার পুকুরে জাল ফেলিব। এইবার থাই কই করিয়াছি। আধা হাত লম্বা হইয়াছে। নাতি নাতনিরা আসিলে মাছধরাও দেখিতে পাইবে টাটকা মাছ খাইতেও পারিবে....

তারপর সেই চিঠি দুইপুত্রের নামে ডাকে ফেলেন। আর পথ চেয়ে থাকেন। ছেলেরা আসবে।

রহমত বলে, চাচাজান। জাউলারা আইসা বইসা আছে। আর কতক্ষণ থাকব।

মনে হয় রুহান রজব আর আইল না।

আইলে আইব। আমরা জাল ফেলি। কই মাছ তো জিয়াল মাছ। থাকব। আইয়া খাইব।

নানা। অরা মাছ তো ঢাকাতেও খায়। এইহানে মাছধরা দেখব।

মনে হয় না আর আইব।

তাইলে জাউলা গো যাইতে কও।

আমি কইতাছি। বাবলু ছুটে চলে।

ভাইসব। আজকা আর মাছধরা হইবে না। জাউলারা চলিয়া যান। ভাইসব...মাইকিং-এর ঢঙে ঘোষণা দিতে দিতে দৌড় দেয় বাবলু।

বাবা একা ঘরে ছেলেমেয়েদের ছবি বের করে দেখে। আর চোখের জল ফেলে। রাত।

পোস্ট অফিসে বাবা।

তিনি আবার টেলিগ্রাম পাঠান। আংকেল আনকনশাস। নো হোপ টু সারভাইভ। কাম শার্প।

আবার বাবলু গাছে। কখন মামারা আসে সেটা নানাকে জানাতে হবে।

গাড়ি আসছে।

বাবলু নেমেই দৌড়। নানা। নানা গাড়ি আসতেছে। নানা দৌড় দৌড়।

তালুকদার টিউবওয়েলপাড়ে গোসল করছিলেন। তিনি গোসল ফেলে তাড়াতাড়ি দৌড়াতে লাগলেন। হুড়মুড় করে শুয়ে পড়লেন। কাঁথা গায়ে। মাথার ওপরে একটা স্যালাইন ঝুলানো ছিল। সেটা তিনি স্কচটেপ মেরে হাতে লাগালেন।

গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামল।

আসমা আর বাবলু গিয়ে সামনে দাঁড়াল।

ওরা নামল।

রজব বলল, কী অবস্থা বাবার?

আসমা মাথা নাড়ে। ভালো না বলে ওরা মনে করে।

রুহান বলে, শোনো সবাই। দাদাভাই সিরিয়াসলি ইল। এখানে পিকনিক করতে কেউ আসো নাই। সবাই চুপচাপ থাকবে।

মিমি বলে, আর সবাই আল্লার কাছে দোয়া পড়ো দাদাভাই যেন সেরে ওঠেন।

সবাই লাইন ধরে তালুকদারকে দেখতে যায়।

তালুকদার চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। সবাই তার পাশে। রুহান গিয়ে বাবার পাশে বসে।

বাবার হাত ধরে।

রুহান কাতর স্বরে ডাকে, বাবা বাবা।

তালুকদার অতিকষ্টে চোখ মেলার অভিনয় করে। আবার চোখ বন্ধ।

রুহান সরে যায়।

রজব বসে। করুণ মুখে ডাকে, বাবা বাবা।

বাবা অতি কষ্টে চোখ মেলার ভঙ্গি করেন। আসমা আসে।

আসমা বলে, আপনারা হাতমুখ ধুইয়া নেন। আমি ভাত বাড়ি।

আর ওদিকে রহমত একা একা তাড়ি খাচ্ছে আর চিল্লাচ্ছে, আমার চাচাশ্বশুর যায় যায় অবস্থা। আমারে জমিটা দিয়া গেল না। আমার কী হবে গো।

তালুকদার আর কতক্ষণ অভিনয় করবেন। তিনি চোখ মেলেন।

ডাকেন, রুহান রুহান। রজব রজব।

বাবা ডাকে নাকি।

তাই তো মনে হচ্ছে।

রুহান রজব দৌড়ে যায়।

রুহান বলে, বাবা। বাবা। তোমার জ্ঞান ফিরেছে।

তালুকদার বলে, তোরা কখন আসছস?

রজব বলে, অনেকক্ষণ বাবা।

আয় কাছে আয়। তোরা আসছিস। আর আমার অসুখ করব না। নাতি নাতনিরা আসে নাই।

আসছে...

ডাক সবাইরে।

রজব গিয়ে সবাইকে ডেকে আনে। সবাই সালাম দেয়। এই সালাম দাও।

এই সময় তালুকদারের হাতের স্কচ টেপ খুলে যায়। স্যালাইনের সুচ বেরিয়ে পড়ে।

রজব বলে, বাবা তোমার স্যালাইন খুলে গেল। ভাবি পারে লাগাতে। ভাবি লাগিয়ে দাও না।

তালুকদার বলেন, নানা লাগাতে হবে না।

মিমি এগিয়ে যায়।

মিমি বলে, কই। বাবার হাতে সুচ তো ঢুকানো ছিল না। শুধু টেপ দিয়ে পেচানো ছিল।বাবা। আপনি আবার মিথ্যা কথা বলে আমাদের এনেছেন না।

তালুকদার বলে, মিথ্যা কী। তোমাদেরকে না দেখলে তো আমি অজ্ঞানই থাকি। তোমরা আসছ। এখন আমার জ্ঞান আইছে।

রজব বলে, বাবা দিস ইজ টু মাচ।

বাবা বলে, কিসের টু মাচ। কইমাছ। কই মাছগুলান কত বড় হইছে। সেইসব ধরা অরা দেখব না। রহমত রহমত। জাউলা ডাক।

রুহান বলে, জেলে ডাকতে হবে না। আমরা এখনই চলে যাচ্ছি।

মিমি বলে, চলো চলো। না গেলে বাবার শিক্ষা হবে না।

আনা বলে, বাবা আপনি আমাদেরকে এতই দেখতে চান। তাহলে আপনি আমাদের সাথে চলেন না কেন।

তালুকদার বলে, মারে। তোমার শাশুড়ির কবরটার টানেই তো যাইতে পারি না।

আনা বলে, তাহলে আমাদেরকে বার বার যন্ত্রণা দেন কেন?

ওরা চলে যাচ্ছে। গাড়ির ধারে সবাই।

তালুকদার বলেন, ওই জাউলা আইসা গেছে। দুইটা খ্যাপ মারব। ৪০.১ কই উঠব। বড় বড় কই। ধরাও দেখ। মাছও লইয়া যা।

রুহান ক্ষিপ্ত—না প্রশ্নই আসে না। তোমার মিথ্যা কথার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। আমরা যাবই।

ওঠো ওঠো।

ওরা ওঠে। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

তালুকদার কাঁদতে থাকে।

গাড়িতে কিছুদূর যাবার পর আনা বলে, আমি কই মাছ খুবই পছন্দ করি।

মিমি বলে, আমিও করি।

আনা বলে, এই চলো না ফিরে যাই। মাছ কটা নিয়েই যাই।

মিমি বলে, চলো। ড্রাইভার গাড়ি ঘোরান।

ক্রন্দনরত তালুকদারের মুখে হাসি– গাড়ি ফিরছে।

কিন্তু চোরের দশদিন সাধুর একদিন। বাঘ সত্যি সত্যি একদিন আসে।

তালুকদার গুরুতর শয্যাশায়ী। তার হাত ধরে আছে ডাক্তার।

তার শ্বাস উঠছে। বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো।

ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার আশা ছেড়ে দেন–আর বেশি সময় নাই। আপনারা খবর দেন সবাইকে।

আসমা পাশে বসে কোরান শরিফ পড়ে সুর করে। কোরান শরিফ তেলাওয়াতের মন্দ্রসুরে পুরো বাড়ির পরিবেশই বিয়োগান্তক হয়ে ওঠে।

রহমত বলে, ডাক্তার সাহেব। এটা আপনি কী বলছেন? আপনি চাচাজানকে ভালো করে তোলেন।

তালুকদার বলেন, রহমত। মুহুরি ডাক। উকিল ডাক। রেজিস্ট্রি অফিসের লোক ডাক। আমি দলিল লেইখা দেই।

রহমত বলে, আমি জমি চাই না। আমি জমি চাই না। আপনে ভালো হয়া ওঠেন।

তালুকদার বলেন, আসমা। ঢাকায় খবর দিছ।

আসমা বলে, দিছি।

তালুকদার বলেন, আসবে না ওরা?

আসমা বলে, জানি না।

রহমত মোবাইলের পর মোবাইল করে হাটের দোকান থেকে। চাচাজান মারা যাইতেছে। আপনারা শেষ দেখা দেখতে হইলে আসেন।

ওরা আসে না।

আসমা কোরান পড়ছে।

রহমত কোরান পড়ছে। গভীর রাত। বিদ্যুৎ নাই। ল্যাম্পোর আলোয় কোরান পড়ছে তারা।

বাবলুও মোনাজাত করে ঘুম ভেঙে গেলে, হে আল্লাহ। নানারে ভালো কইরা দেও। হে আল্লাহ...

দরজায় বাতাসের শব্দ হয়।

তালুকদার চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন। এই বুঝি ওরা এলো। তিনি ছবিটা বের করে তাকান। মাথার কাছে তার একটা মোমবাতি।

আবার দরজায় শব্দ হয়।

আসমা উঠে দরজা খুলে দেখে। কেউ নাই। বাতাস।

বাতাসের ঝাপটায় ঘরের মোমবাতি ল্যাম্পো দুটোই নিভে যায়।

Fajil by Anisul Haque

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com